বংশ-পরিচয়

ত্রয়োদশ খণ্ড

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সঙ্কলিত

বৈশাখ, ১৩৪১

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার
২০৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ কোঁঙার,
উমাশঙ্কর প্রেস,
৯নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

বাণী ও কমলার বরপুত্র সুপণ্ডিত

বিদ্যোৎসাহী সাহিত্যানুরাগী

লোকহিতব্রত

ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের

করকমলে

বংশপরিচয়—ত্রয়োদশ খণ্ড

শ্রদ্ধা ও অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল।

বৈশাখ, ১৩৪১



ডাঃ কুমার নরেন্দ্র নাথ লাহা,

এম-এ, বি-এল, পি, আর, এস্

সূচীপত্র



স্বর্গীয় ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

বংশ-পরিচয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ছত্রিশ বৎসরের উপর হইল, বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু আজিও বিদ্যাসাগর বলিলে বাঙ্গালায় একমাত্র দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই বুঝায়। বিদ্যাসাগরের পরিচয় বিদ্যাসাগর ; তাঁহার তুলনা—তিনি।

জন্ম ও বংশ-কথা

বিদ্যাসাগর ইংরেজী ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার বেলা বারটার সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রাম বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান। কিন্তু এই গ্রাম তাঁহার পিতৃ-পিতামহ বা তৎপূর্ব্ব পুরুষগণের জন্মস্থান নহে। তাঁহাদের জন্মস্থান হুগলী জেলার বনমালিপুর গ্রামে; ইহা তারকেশ্বরের প্রায় চারিক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং তাঁহার পিতৃ-পিতামহের পরিচয় এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

"প্রপিতামহ-দেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ সন্তান। জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার পিতামহ। বিদ্যালঙ্কার-মহাশয়ের দেহত্যাগের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম, সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে

লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষে, তাঁহাদের সহিত রামজয় তর্ক-ভূষণের কথান্তর উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মতান্তর ঘটিয়া উঠিল। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এককালে, দেশত্যাগী হইলেন।

"বীরসিংহ গ্রামে উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে এক অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দুর্গাদেবীর গর্ভে তর্কভূষণ মহাশয়ের দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক।

রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন; দুর্গাদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া, বনমালিপুরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দুর্গাদেবীর লাঞ্ছনাভোগ ও তদীয় পুত্রকন্যাদের উপর কর্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর, এতদূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল যে, দুর্গা-দেবীকে পুত্রদ্বয় ও কন্যাচতুষ্টয় লইয়া, পিত্রালয়ে যাইতে হইল। * * * কতিপয় দিবস অতি সমাদরে অতিবাহিত হইল। দুর্গাদেবীর পিতা, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; এজন্য সংসারের কর্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামসুন্দর বিদ্যাভূষণের হস্তে ছিল।

"কিছুদিনের মধ্যেই, পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে কালযাপন করা দুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্য্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ। * * অবশেষে দুর্গাদেবীকে, পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে, এক কুটীর নির্ম্মিত করিয়া দিলেন। দুর্গাদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া, সেই কুটীরে অবস্থিতি ও অতিকষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাসাগর-জনক ঠাকুরদাস

"ঐ সময়ে, টেকুয়া ও চরকায় সূতা কাটিয়া, সেই সূতা বেচিয়া, অনেক নিঃসহায় নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের গুজরান করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। * * তাদৃশ অল্প আয় দ্বারা নিজের দুই পুত্রের ও চারি কন্যার ভরণপোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা, সময়ে সময়ে, যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন; তথাপি তাহাদের আহারাদি সর্ব্ববিষয়ে, ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। এই সময়ে জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম ১৪।১৫ বৎসর। তিনি মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জ্জনের চেষ্টায়, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।"

বিদ্যাসাগর-জনক ঠাকুরদাস কৈশোরের প্রারম্ভেই কলিকাতায় আগমন করেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁহাদের নিকট জ্ঞাতি পণ্ডিত জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কারের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তিনিও আশ্রয় দেন। বীরসিংহে ঠাকুরদাস সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন; ন্যায়ালঙ্কারমহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িয়া কৃতবিদ্য হইবেন—ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু বাটীতে জননী ও ভাই-ভগিনীগুলির দুরবস্থার কথা স্মরণ হইলেই তাঁহার সে সঙ্কল্প কোথায় ভাসিয়া যাইত। তাই অনেক বিবেচনার পর স্থির হইল যে, তিনি যাহাতে শীঘ্র উপার্জ্জনক্ষম হন সে জন্য কর্ম্মোপযোগী চলনসই রকমের ইংরেজী শিখিবেন। তাহারাই ব্যবস্থা হইল। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ভদ্রলোক সন্ধ্যার পরে ঠাকুরদাসকে ইংরাজী পড়াইতে স্বীকৃত হইলেন। ঠাকুরদাস প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকটে গিয়া ইংরাজী পড়িতেন। পড়া শেষ করিয়া আসিতে তাঁহার রাত্রি হইত। কিন্তু এদিকে ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে সন্ধ্যার পরেই উপরি লোকের আহার-ব্যাপার শেষ হইয়া যাইত। কাজেই তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। ফলে তিনি শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে

লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষক ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্তই খুলিয়া বলিলেন। ঐ সময়ে শিক্ষকের এক আত্মীয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঠাকুরদাসকে বলিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ নহি, শূদ্র। আমাদের রন্ধন করা অন্ন ত আপনি খাইতে পারিবেন না। যদি আমার বাটীতে আপনি নিজের ভাত নিজে রাঁধিয়া খাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে আমার বাড়ীতে থাকিবার স্থান দিতে পারি। ঠাকুরদাস ইঁহার প্রস্তাব সুবিধাজনক মনে করিয়া ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাসা ত্যাগ করিলেন এবং ইঁহারই নিকট বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া ঠাকুরদাসের দুইবেলা আহার ও ইংরেজী লেখাপড়া চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে এই আশ্রয়দাতার সময় মন্দ হইল; তাঁহার আয় একেবারে কমিয়া গেল। এই সময়ে ঠাকুরদাসের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। কোনও দিন একবেলা আহার জুটিত, কোনও দিন তাহাও জুটিত না। এই সময়ে এক বর্ষীয়সী বিধবা মুড়ি-মুড়কিওয়ালী তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দিনের বেলায় পেট ভরিয়া ফলার খাওয়াইতেন। কিছুদিন পরে এই আশ্রয়দাতাই তাঁহাকে একটি কর্ম্ম জুটাইয়া দেন। উহার বেতন হইল মাসিক দুই টাকা। ঠাকুরদাসের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি এই আশ্রয়দাতার নিকটেই পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিয়া বেতনের দুই টাকা প্রতি মাসেই মাতার নিকটে পাঠাইতে লাগিলেন। দুই তিন বৎসরের পরেই তাঁহার বেতন মাসিক পাঁচ টাকা হইল। তখন তাঁহার জননীর ও ভাইভগিনীগুলির কষ্ট দূর হইল। এই সময়ে ঠাকুরদাসের পিতা রামজয় তর্কভূষণ মহাশয়ও বীরসিংহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সহিত সম্মিলিত হইলেন। কয়েকদিন বীরসিংহে থাকিয়া তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাসকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় গমন করিলেন। তিনি ঠাকুরদাসের নিকট উপস্থিত হইলে ঠাকুরদাসের

আশ্রয়দাতা তাঁহার নিকটে ঠাকুরদাসের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইহাতে তর্কভূষণমহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

বড়বাজার দয়েহাটায় তর্কভূষণমহাশয়ের এক পরিচিত সঙ্গতিশালী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহার নাম ভাগবতচরণ সিংহ। তিনি যেমন দয়াশীল তেমনই সদাশয় ছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় তাঁহাকে সকল বিষয় জানাইলে তিনি বলিলেন—ঠাকুরদাসকে আমার বাটীতে রাখুন; আমি তাহার আহার প্রভৃতির ভার লইতেছি। সে যখন স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে পারে, তখন আর ভাবনা কি?

তদবধি ঠাকুরদাস সিংহ মহাশয়ের বাটীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। আশ্রয়ের সুবিধা করিয়া দিয়া তর্কভূষণমহাশয় বীরসিংহে ফিরিয়া যাইলেন। তখন হইতে ঠাকুরদাসের আহারের কষ্ট দূর হইল। তিনি যথাসময়ে দুই বেলা আহার পাইয়া আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করিলেন। পরন্তু এই সময়ে সিংহমহাশয়ের চেষ্টায় তিনি মাসিক আট টাকা বেতনের একটি কর্ম্মও পাইলেন।

ঠাকুরদাসের আট টাকা মাহিনা হইয়াছে শুনিয়া তদীয় জননী দুর্গাদেবীর আনন্দের সীমা রহিল না। এই সময়ে ঠাকুরদাসের বয়স প্রায় তেইশ চব্বিশ হইয়াছিল। এই সময়েই তাঁহার বিবাহ হয়। গোঘাট-নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীই তাঁহার পত্নী। এই ভগবতী দেবীই বিদ্যাসাগরের জননী।

শৈশবে বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র যখন মাতৃগর্ভে, সেই সময়ে তাঁহার মাতা উন্মাদরোগগ্রস্তা হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে গর্ভে ধারণ করিয়া অবধি তাঁহার এই রোগ হয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইবার পরই তাঁহার এই রোগ সারিয়া যায়; জনৈক জ্যোতিষী ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের

পূর্ব্বে গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভগবতী দেবীর গর্ভে দয়ার অবতার জন্মগ্রহণ করিবেন। উত্তরকালে তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী যে ফলবতী হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পিতামহ রামজয় তাঁহার এই পৌত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—ঈশ্বর। পঞ্চম বৎসরে গ্রাম্য পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। পাঠশালাতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিন বৎসরে তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করেন। তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত দুষ্ট ছিলেন, তাঁহার দুষ্টামির জ্বালায় পাড়ার লোক অস্থির হইত।

পাঠশালার বিদ্যা শেষ হইলে গুরুমহাশয় ঠাকুরদাসকে বলেন,—এখানকার পড়া শেষ হইয়াছে। বালক বড় বুদ্ধিমান। ইহাকে আপনি কলিকাতায় লইয়া গিয়া ইংরাজী লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা করুন।

কলিকাতায় আগমন

১২৩৬ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষে ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। তখন তাঁহার বয়স ৮ বৎসর মাত্র। তখন হাঁটা পথে কলিকাতায় আসিতে হইত। পথে আসিতে আসিতে 'মাইল-ষ্টোনে' অঙ্কিত সংখ্যা দেখিয়া তিনি ইংরেজীর ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত অঙ্ক শিখিয়া লইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পিতৃদেবের আশ্রয়দাতা ভাগবতচরণ সিংহের বাটীতেই আশ্রয় পাইলেন। সিংহ-পরিবার তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। বিশেষতঃ সিংহমহাশয়ের কন্যা রাইমণি ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রাধিক ভালবাসিতেন।

কলিকাতায় আসিবার পর প্রথম তিন মাস ঈশ্বরচন্দ্রকে কোনও স্কুলে ভর্ত্তি করা হয় নাই, সেই জন্য এই তিন মাসকাল তিনি নিকটবর্ত্তী একটী পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন। ফাল্গুন মাসে তাঁহার ভীষণ

রক্তাতিসার রোগ হয়। সুতরাং তাঁহাকে বীরসিংহে ফিরিয়া যাইতে হয়। পুনরায় জ্যৈষ্ঠ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসেন।

সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি

১২৩৬ সালে, ২০শে জ্যৈষ্ঠ বা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন সোমবার তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। তিনি ব্যাকরণ শ্রেণীর তৃতীয় বিভাগে ভর্ত্তি হন এবং সন্ধিসূত্র হইতে পাঠ আরম্ভ করেন। ছয় মাস পরে এই শ্রেণীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রায় ৪০০ উদ্ভট শ্লোক শিখিয়াছিলেন। ব্যাকরণ-শ্রেণীতে তিনি দুই বৎসর পারিতোষিক পাইয়াছিলেন।

ব্যাকরণ পড়িবার সময়ে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের ইংরেজী শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণীতে তিনি মাত্র ছয় মাস পড়িয়াছিলেন। সুতরাং ছাত্রজীবনে তাঁহার ভাল ইংরেজী শিক্ষা হয় নাই; ইংরেজী শিখিয়াছিলেন তিনি কর্ম্মজীবনে।

ব্যাকরণ-শ্রেণীতে তিনি সাড়ে তিন বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিন বৎসরে ব্যাকরণ-পাঠ শেষ করিয়া তিনি অমরকোষের মনুষ্যবর্গ ও ভট্টি কাব্যের পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র রাত্রিতে মাত্র দুই তিন ঘণ্টা ঘুমাইতেন; অবশিষ্ট সময় পাঠাভ্যাস করিতেন।

১২ বৎসর বয়সে তিনি কাব্য-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। প্রথম বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্র রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, রাঘব-পাণ্ডবীয় প্রভৃতি সাহিত্য-পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে তিনি মাঘ, ভারবি, শকুন্তলা, মেঘদূত, উত্তর-চরিত, বিক্রমোর্ব্বশী, মুদ্রারাক্ষসী, কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি পাঠ করেন। এসকল কাব্য তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। এই বৎসরও তিনি পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তাক্ষর অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি বিস্তর সংস্কৃত পুঁথি

স্বহস্তে লিখিয়া লইতেন। পুঁথির লেখা দেখিয়া সকলে তাঁহার প্রভূত প্রশংসা করিতেন।

ভ্রাতৃবাৎসল্য

এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু শিক্ষার্থ কলিকাতায় আগমন করেন। সিংহবাবুদের বাটীতেই বাসা। দীনবন্ধুও এই বাসাতেই আসিয়া উঠিলেন। এই সময়ে দীনবন্ধুকে লইয়া বাসায় চারিটী লোক হইল। ঈশ্বরচন্দ্র এই চারিজনের জন্য ভাত রাঁধিতেন, বাজার করিতেন, স্বহস্তে কাঠ চালা করিতেন এবং বাটনাও বাটিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার অসীম আনন্দ হইত। তিনি রন্ধনের বা পাঠাভ্যাসের ক্লেশকে কখনও ক্লেশ বলিয়া মনে করিতেন না।

ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রও অধ্যয়নের জন্য কলিকাতায় আসেন। সিংহবাবুদের বাটীর সম্মুখে তিলকচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক ভদ্রলোকের বাটীর নিম্নতলে একটি ঘরে ঈশ্বরচন্দ্র শয়ন করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। পাঠাভ্যাসে তাঁহার অসামান্য যত্ন ছিল। কলেজে যাইবার ও কলেজ হইতে আসিবার সময়ে তিনি পুস্তক খুলিয়া পড়িতে পড়িতে যাইতেন ও আসিতেন। তাঁহার জননী চরকায় সূতা কাটিয়া, সেই সূতায় কাপড় তৈয়ারী করিয়া পাঠাইয়া দিতেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহাই পরিতেন। এই মোটা কাপড় ও চাদর বড় হইয়াও তিনি ত্যাগ করেন নাই। বিলাস-স্পৃহা তাঁহার একেবারেই ছিল না।

বিদ্যাভ্যাসে ঈশ্বরচন্দ্রের ত্রুটি ছিল না। একটু ত্রুটি যদি দৈবাৎ ঘটিত, তাহা হইলে পিতা ঠাকুরদাস অত্যন্ত কঠোর শাসন করিতেন। তিনি পিতার শাসনকে অত্যন্ত ভয় করিতেন।

কাব্য ও ব্যাকরণে ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি অতি অল্প বয়সেই উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারি-

তেন। তাঁহার এই সকল কবিতা তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিত।

বিবাহ

এই সময়ে ক্ষীরপাই-নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য্যের কন্যা দীনময়ীর সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হয়। এ বয়সে তাঁহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু পিতার অনুরোধে তিনি বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ। এক বৎসরের মধ্যে তিনি সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর প্রভৃতি অলঙ্কার-গ্রন্থ পাঠ করেন এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তিনি কলেজে মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি পাইতেন। বৃত্তির সমস্ত টাকা তিনি পিতার হাতে দিতেন। তাঁহার প্রথমাবস্থার বৃত্তিলব্ধ টাকায় পিতা ঠাকুরদাস বীরসিংহ গ্রামে কিছু জমি কিনিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার টোল বসাইবার সঙ্কল্প ছিল। পরে ঈশ্বরচন্দ্র যে বৃত্তির টাকা পাইতেন, পিতা তাহার সমস্ত লইতেন না। বৃত্তির টাকায় তিনি কতকগুলি হস্তলিখিত পুঁথি কিনিয়াছিলেন; সেগুলি তাঁহার লাইব্রেরীতে ছিল। বাল্যকাল হইতেই তিনি পরদুঃখমোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বৃত্তির যে সামান্য টাকা তাঁহার পিতা তাঁহার নিকট হইতে লইতেন না, সেই টাকায় তিনি পরের দুঃখমোচন করিতেন। কাহারও রোগ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। কোনও ব্যক্তির সংক্রামক পীড়া হইলে অপর কেহ তাহার নিকটে যাইতে ভয় করিত, কিন্তু তিনি অসঙ্কোচে তাঁহার মলমূত্রাদি পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিতেন। পরের দুঃখ দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া পড়িতেন, তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইত।

বাল্যকালে ঈশ্বরচন্দ্রের সখ ও সাধের মধ্যে ছিল, কবির গান

শোনা, কপাটী ও লাঠি খেলা। তিনি যেখানেই যে কবির গান শুনিতেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। তাঁহার নিকট কবির গানের একখানি প্রকাণ্ড খাতা ছিল।

অলঙ্কারপাঠ শেষ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। কলেজের নিয়ম ছিল যে, ন্যায়দর্শন ও বেদান্ত না পড়িয়া কেহ স্মৃতি পড়িতে পাইবেন না। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিলেন। তিনি ন্যায়দর্শন ও বেদান্ত পড়িবার পূর্ব্বেই স্মৃতি পড়িবার আদেশ পাইয়াছিলেন। এ সময়ে তাঁহার বয়স সতেরো আঠারো বৎসরের অধিক হইবে না। তিনি ছয় মাসে স্মৃতির পাঠ শেষ করেন। সমগ্র স্মৃতি তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল।

প্রথম চাকুরী প্রত্যাখ্যান

ছয় মাসে স্মৃতির পাঠ শেষ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র 'ল কমিটী'র পরীক্ষা দেন এবং সম্মানের সহিত এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষা দিবার উদ্দেশ্য—জজ পণ্ডিতের পদ-প্রাপ্তি। প্রধানতঃ এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার পিতৃ-বন্ধু ও মুরুব্বিগণ সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়াছিলেন। এই সময়ে ত্রিপুরা জেলায় জজ-পণ্ডিতের পদ খালি হয়। তিনি এই পদের প্রার্থনা করিবামাত্রই তাহা পূর্ণ হয়। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা এতদূরে গিয়া চাকুরী লইতে তাঁহাকে নিষেধ করেন। কাজেই তিনি এই পদ গ্রহণ করেন নাই।

অতঃপর তিনি বেদান্ত-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। বেদান্ত পড়িবার সময়ে তিনি গদ্যরচনায় সর্ব্বোচ্চ হইয়া ১০০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি ন্যায়শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি ১০০৲ টাকা এবং কবিতা রচনা করিয়া ১০০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের পাঠ ঈশ্বরচন্দ্র ৫ বৎসরে শেষ করেন। অপরের পক্ষে যাহা শেষ করিতে ৮।১০ বৎসর লাগে, তাঁহার পক্ষে তাহাই ৫ বৎসর লাগিল। ঈশ্বরচন্দ্রের অদ্ভুত মেধা ও মনীষার ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট পরিচয় আর কি হইতে পারে?

'বিদ্যাসাগর'-উপাধিলাভ

সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলেজ হইতেই "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন। উপাধির সনন্দে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখ লিখিত আছে।

প্রথম অধ্যাপনা-কার্য্য

ইহার পর তিনি দুই মাসকাল ৫০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে জন মিয়র নামক জনৈক সিবিলিয়ানের প্রস্তাবে ঈশ্বরচন্দ্র পুরাণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও পাশ্চাত্য মতের অনুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ে এক শত শ্লোক রচনা করিয়া ১০০৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

কর্ম্মক্ষেত্রে

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের পাঠ যখন সমাপন করেন, সেই সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ খালি হয়। কলেজের সেক্রেটারী মার্শাল সাহেব তাঁহাকে এই পদে নিযুক্ত করেন। এই পদের বেতন ছিল তখন ৫০৲ টাকা। তিনি এইখানে কার্য্য করিবার সময়ে হিন্দী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন।

বিদ্যাসাগর ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রত্যহ প্রাতে ইংরেজী শিক্ষা করিতেন। তখন তাঁহার বাসা ছিল বহুবাজারে হৃদয়-রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা-বাটীতে। নীলমাধববাবু কলিকাতা

তালতলার প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন। দুর্গাচরণ তখনও ডাক্তার হন নাই। তিনি হেয়ার সাহেবের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। এই সময়ে দুর্গাচরণবাবু প্রত্যহ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় আসিতেন। ক্রমে উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। নীলমাধববাবুর কাছে কিছুদিন ইংরেজী শিখিয়া তিনি হিন্দু কলেজের অন্যতম ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্তের নিকট রীতিমত ইংরেজী শিক্ষা করেন।

সংস্কৃত শিক্ষার সহজ পদ্ধতি

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বাসায় ইংরেজী শিখিতেন, তখন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ সরকার, নীলমণি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেন। তিনি এমন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতেন যে, অতি দুরূহ বিষয়ও অল্পদিনের মধ্যে সহজে শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত হইত। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নিকটে শিক্ষা লাভ করিয়া আড়াই বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রভূত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের অধ্যাপনা-কৌশলেই রাজকৃষ্ণ ১৮৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের "সিনিয়র" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি পান।

পরে তিনি শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নিকট সেক্সপীয়র অধ্যয়ন করেন। এই শোভাবাজার-রাজবাটীতেই অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। অক্ষয়কুমার তখন "তত্ত্বোধিনী" পত্রিকার সম্পাদক। এই সূত্রে তিনি তত্ত্বোধিনী সভার অন্তর্গত পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রভূত সম্মান করিতে থাকেন।

মহাভারত অনুবাদ

অক্ষয়কুমার দত্তের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় মূল মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। আদিপর্ব্বের কিঞ্চিদংশ পত্রিকায় মুদ্রিতও হইয়াছিল। কিছুদিন অনুবাদ ছাপা হইবার পর কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুমতি লইয়া মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ করিতে থাকেন।

মহাভারত অনুবাদ করিবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় "বাসুদেব-চরিত" ও "বেতাল পঞ্চবিংশতি" এই দুই পুস্তকের অনুবাদ করেন। বলা বাহুল্য, এই কার্য্যে তাঁহার প্রভূত কৃতিত্ব প্রকটিত হয়।

পিতার অবসরগ্রহণ

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে কার্য্য করিবার সময়ে তিনি একদিন তাঁহার পিতাকে বলেন,—আমার ৫০৲ টাকা মাহিনা হইয়াছে, ইহাতেই স্বচ্ছন্দে চলিবে, আপনি আর কেন পরিশ্রম করেন? এইবার অবসর লইয়া দেশে গিয়া থাকুন। বলা বাহুল্য, পুত্রের অনুরোধে পিতা কর্ম্মত্যাগ করিয়া বীরসিংহে চলিয়া যান।

এই কলেজেই কর্ম্ম করিবার সময়ে তিনি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে "বাসুদেব-চরিত' নামক একখানি গ্রন্থরচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে উহা রচিত। পুস্তকখানির যেমন লিপি-কৌশল, তেমনই ভাষা-পরিপাট্য। কিন্তু কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ইহা সিবিলিয়ানদের পাঠ্যরূপে অনুমোদিত করেন নাই। তৎকালে ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে কতকগুলি বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক ছিল, সেগুলির কোনও খানিই "বাসুদেব-চরিতে"র সমকক্ষ ছিল না। দুঃখের বিষয়, এই পুস্তক মুদ্রিত হয় নাই।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্য ত্যাগ করেন এবং পরবর্ত্তী মাসেই তিনি সংস্কৃত কলেজের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত মহাশয়ের অনুরোধেই তিনি এই পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন এই পদের বেতনও ৫০৲ টাকা ছিল।

সংস্কৃত কলেজের সংস্কার

সংস্কৃত কলেজের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অনেক সংস্কার করেন। পূর্ব্বে কি অধ্যাপক, কি ছাত্র কলেজে আসিবার যাইবার কাহারও কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। একদিন তিনি সকল অধ্যাপকের আগমনের পূর্ব্বে সমাগত হইয়া কলেজের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে আপন মনে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। অধ্যাপকগণ বুঝিলেন,—অতঃপর তাঁহাদিগকে যথা সময়ে প্রত্যহ কলেজে আসিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ আচরণে তাঁহারা নিয়মানুবর্ত্তিতার সঙ্কেত পাইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত পাঠ্য-সাহিত্য হইতে অশ্লীল কবিতা তুলিয়া দিয়াছিলেন, সাহিত্যশ্রেণীতে অঙ্কশিক্ষার ব্যবস্থারও প্রবর্ত্তন তিনি করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরমহাশয় চিরকাল গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। ইতপূর্ব্বে সংস্কৃতকলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে এই পদ গ্রহণ করিতে বলেন। তিনি তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত। এই পদের বেতন ৮০৲ টাকা। বিদ্যাসাগর কিন্তু সাহেবকে বলিয়া পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে এই পদ প্রদান করেন। কেবল তাহাই নহে,—এই সংবাদ দিবার জন্য তিনি একরাত্রে ২৪।২৫ ক্রোশ পথ চলিয়া অম্বিকা-

কালনায় উপস্থিত হন। এবার তাঁহার এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী থাকিবার সময়েই সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকপদ শূন্য হয়। রসময়বাবু বিদ্যাসাগরকে এই পদগ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু তিনি ইহাতে সম্মত না হইয়া তাঁহার সহাধ্যায়ী মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়কে এই পদের জন্য সুপারিশ করেন। ফলে তিনিই এই পদে নিযুক্ত হন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা দ্বাদশবর্ষীয় বালক হরচন্দ্র ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। এই শোকে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজের কর্ম্মত্যাগ করিলে তাঁহারই অনুরোধে তাঁহার ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটে। শিক্ষাপদ্ধতি-সম্বন্ধে তিনি যেসকল প্রস্তাব করিতেন সেগুলির কোনও কোনওটী সেক্রেটারীর অনুমোদিত হইত না। তেজস্বী বিদ্যাসাগর ইহা অমর্য্যাদাকর বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি কোনও চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। এই সময়ে তিনি হিন্দী ও ইংরেজীতে অনেকটা ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্শাল সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় "বৈতাল পঁচ্চিশী" নামক হিন্দী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন; ইহাই 'বেতালপঞ্চবিংশতি'। এই সময়ে তিনি "সংস্কৃতযন্ত্র' নামক এক ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাতে প্রথমে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অংশ ছিল; পরে তিনি উহার স্বত্বাধিকার ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ছাপাখানায় সর্ব্বপ্রথম ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।

মার্শাল সাহেব ৬০০৲ টাকা দিয়া এই গ্রন্থের একশত খণ্ড ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য ক্রয় করেন। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার সময়ে ৬০০৲ টাকা ঋণ করিয়া একটি প্রেস খরিদ করা হইয়াছিল। এই ৬০০৲ টাকায় সেই ঋণ পরিশোধ হয়। ক্রমে এই ছাপাখানায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে থাকে।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শাল সাহেবের অনুরোধে মার্শম্যান সাহেবের "History of Bengal" অর্থাৎ ইংরেজিতে লিখিত বঙ্গদেশের ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ করেন। এই অনুবাদের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ও মনোহর, সেইরূপ বিশুদ্ধ। ইহাকে মোটেই অনুবাদ-গ্রন্থ বলিয়া মনে হয় না।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের "হেড্ রাইটার" ও "ট্রেজারার"-পদ শূন্য হয়। মার্শাল সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পদ গ্রহণ করেন। তখন এই পদের বেতন ৮০৲ টাকা ছিল।

এই সময়ে হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্র "শুভকরী" নামে এক পত্রিকার প্রচার করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের অনুরোধে এই পত্রিকায় বাল্যবিবাহের দোষ উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার জন্য 'শুভকরী'র কতকটা প্রতিপত্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই।

এই বৎসরই বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ ও ঢাকা কলেজের সিনিয়র ছাত্রদের বাঙ্গালা পাঠ্যের পরীক্ষক হন। সেইবার বাঙ্গালা রচনার প্রশ্ন ছিল—স্ত্রীশিক্ষা হওয়া উচিত কি না। এই সম্পর্কে বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সে পরিচয় পরে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বেথুন বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রথমে

ইহার নাম ছিল—হিন্দু বালিকাবিদ্যালয়। ২৫টী ছাত্রী লইয়া এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময়েই তিনি সংস্কৃত কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়র বিভাগের বার্ষিক পরীক্ষাগ্রহণের ভার প্রাপ্ত হন। তিনি ও জর্ম্মণ পণ্ডিত ডক্টর রোয়ার ঐ দুই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিতেন। প্রশ্নপত্র তৈয়ার করিবার জন্য উভয়ে সম্মানস্বরূপ কিছু কিছু অর্থ পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় উহা সৎকার্য্যে ব্যয় করেন। সিনিয়র পরীক্ষায় রামকমল ভট্টাচার্য্য কাব্যে ও অলঙ্কারে সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর ঐ টাকা হইতে তাঁহাকে সমগ্র সংস্কৃত মহাভারত কিনিয়া দিয়াছিলেন; অতঃপর যে অর্থ উদ্বৃত্ত ছিল তাহা গরীব-দুঃখীকে দান করিয়াছিলেন।

পুত্রের জন্ম

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণ-চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় পঞ্চম সহোদর হরিশচন্দ্র বিসূচিকারোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়েন। তিনি শোকাতুরা জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। ৫।৬ মাস কলিকাতায় থাকিয়া তিনি বীরসিংহে ফিরিয়া যান।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর-রচিত "জীবন-চরিত" প্রকাশিত হইয়াছিল। রবার্ট ও উইলিয়ম চেম্বার্স-কৃত জীবন-চরিতের কতিপয় চরিত্র-অবলম্বনে "জীবন-চরিত" রচিত। প্রধানতঃ ইহাও অনুবাদ কিন্তু এই অনুবাদে বিদ্যাসাগরের লিপিকৌশল ও কৃতিত্ব পরিস্ফুট। 'জীবন-চরিতে' কেবল বিদেশীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার-পদ ত্যাগ করেন এবং তৎপরদিন ৯ই ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। এই পদের বেতন ছিল ৯০৲ টাকা। ইহার পূর্ব্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কার এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত হইলে এই পদ শূন্য হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটারের শূন্য পদে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে কর্তৃপক্ষ তাঁহার শিষ্য ও বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করেন।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই পদ নূতন সৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতাকার্য্য সেক্রেটারী ও এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী—এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। এই দুই পদ রহিত হইয়া প্রিন্সিপালের পদ সৃষ্ট হয়। সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা করিলে ভবিষ্যতে কলেজের উন্নতি হইতে পারে—এই সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের উপর একটা রিপোর্ট লিখিবার হুকুম হয়। তিনি যে রিপোর্ট লিখেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে কলেজের প্রিন্সিপাল করিয়া দেন। এই পদের বেতন হয় মাসিক ১৫০৲ টাকা।

প্রিন্সিপাল হইয়া তিনি কলেজের আমূল-সংস্কারে ব্রতী হন। এজন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইত। ছাত্রগণকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। এইজন্য ছাত্রেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য-সংস্কারও তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। এইজন্য তিনি এই সময়ে পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর তাঁহার 'উপক্রমণিকা ব্যাকরণ'

প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ঋজুপাঠ তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়; তৎপূর্ব্বে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল; তৃতীয়ভাগ ঋজুপাঠ এনট্রান্স পরীক্ষার পাঠ্য ছিল। এই বৎসরই 'ব্যাকরণ কৌমুদী'র ১ম ও ২য় ভাগ প্রকাশিত হয় এবং পর বৎসর ৩য় ভাগ মুদ্রিত হয়। উপক্রমণিকা ও কৌমুদী তিন ভাগ আয়ত্ত হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের মোটামুটী রকম জ্ঞান হইয়া থাকে।

গ্রন্থরচনা

এই সময়ে তাঁহার "বোধোদয়"ও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বীটন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য চেম্বার্স সাহেবের "Rudiments of knowledge" নামক গ্রন্থ-অবলম্বনে "বোধোদয়" অনূদিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'কথামালা'ও এই সময়ে রচিত। ইহাও ঈশপের গল্পের অনুবাদ; অনুবাদ প্রাঞ্জল ও ত্রুটিশূন্য।

তিনি ছাত্রদের কায়িক দণ্ডবিধানের মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। একদিন সংস্কৃত কলেজের কোনও অধ্যাপক তাঁহার শ্রেণীর ছেলেগুলিকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় অধ্যাপককে আড়ালে ডাকিয়া রঙ্গচ্ছলে বলেন, "তুমি যাত্রার দল করেছ নাকি?" অধ্যাপক অপ্রতিভ হইয়া ভবিষ্যতে ছেলেদের আর এরূপ শাস্তি দেন নাই। আর একবার এই অধ্যাপকের টেবিলে একগাছি বেত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "বেত কেন হে?" অধ্যাপক উত্তর দেন—"ম্যাপ দেখাইবার সুবিধা হয়।" বিদ্যাসাগর তখন বলেন, "হাঁ রথ দেখা ও কলা বেচা দুইই হয়; কখনও ম্যাপ দেখানোও হয় আবার কখনও ছেলেদের পিঠেও পড়ে।" তিনি ছাত্রদের শারীরিক দণ্ডদান নিষেধ করিয়া এক ইস্তাহার (circular) জারিও করিয়াছিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ণ সহানুভূতি ও প্রচেষ্টা ছিল। এইজন্য বীটন সাহেব তাঁহাকে স্ব-প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ের

অবৈতনিক সেক্রেটারী করিয়াছিলেন। পরে বীটন সাহেবের মৃত্যু হইলে তিনি নানা কারণে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন, তখন সেখানে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভিন্ন অপর বর্ণের ছাত্র লইবার নিয়ম ছিল না। কিন্তু তিনি প্রিন্সিপাল হইয়া প্রস্তাব করেন যে, সংস্কৃত কলেজে কায়স্থ ও অন্যান্য জাতীয় ছাত্রও ভর্ত্তি করা হউক। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার এই প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। অতঃপর কায়স্থ ও অন্যান্য বর্ণের ছাত্রও সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের অধিকার প্রাপ্ত হয়।

সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিন্সিপাল হইবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লইবার নিয়ম ছিল না। গবর্ণমেণ্ট বিনা বেতনে ছাত্রদিগকে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সকল জাতীয় ছাত্রের নিকট হইতে বেতন লইবার নিয়ম করেন; কর্ত্তৃপক্ষও তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন।

সংস্কৃত শিক্ষার নূতন পদ্ধতি

বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত শিক্ষা করিবার জন্য নূতন প্রণালীতে উপক্রমণিকা, ব্যাকরণকৌমুদী, ঋজুপাঠ প্রভৃতি যেসকল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, সেইসকল পুস্তক সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য হইল। পূর্ব্বে ইংরেজী পড়া, না পড়া ছাত্রদের ইচ্ছার অধীন ছিল; এক্ষণে উচ্চ কয়েক শ্রেণীতে উহা অবশ্যপাঠ্য হইল। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধারণের সংস্কৃত শিক্ষার সুবিধাজনক যে নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করেন তাহা শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদিত হইয়াছিল। তবে পণ্ডিতেরা অনুযোগ করিতে লাগিলেন যে, ইহাতে সংস্কৃতে ভাসা-ভাসা জ্ঞান লাভের সুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সুগভীর জ্ঞান-লাভের ব্যবস্থা হয় নাই।

বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের বিন্যাস-সাধন

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় ক্রমিক জ্ঞান লাভ করিবার মত সুপ্রণালীবদ্ধ পাঠ্যপুস্তক ছিল না; সংস্কৃত শিক্ষারও এইরূপ দুরবস্থা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষার এই অন্তরায় দূর করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেই দুরবস্থার দিনে আমাদিগকে শিক্ষামার্গে অগ্রসর করিবার জন্য যে সকল পাঠ্য-রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি কোনও কোনও ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকের অনুবাদ হইলেও উহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৌলিকত্ব ও প্রতিভার পূর্ণপরিচয় প্রকট। তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ অতুলনীয়; দ্বিতীয় ভাগও তাহাই। 'কথামালা' ও 'বোধোদয়ে'র তুলনা নাই; তাঁহার 'আখ্যানমঞ্জরী', 'চরিতাবলী' বৈদেশিক আখ্যান ও জীবন-কথায় পূর্ণ হইলেও ভাষা শিক্ষার পক্ষে ঐগুলি যে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাঠ্যপুস্তকে বিদেশীয়গণের চরিত-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যাসাগরকে কেহ কেহ খাটো করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই পুস্তক কয়খানি রচিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের কেহই পাঠ্যপুস্তক-রচনায় মৌলিক বা অ-মৌলিক কোনও প্রকার পদ্ধতিরই প্রবর্ত্তন করিতে পারেন নাই।

বিদ্যাসাগর মহাশয়-প্রণীত 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'ভ্রান্তিবিলাস', এবং ব্যাকরণকৌমুদী চতুর্থ ভাগ বিপুল সমাদর লাভ করিয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন না; যেসকল সভা-সমিতি তখন পাঠ্য-রচনায় ব্রতী ছিল সেইসকল সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়া তিনি উহাদের সমুৎসাহিত করিতেন। এই সময়ে ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটী ও স্কুলবুক সোসাইটী বহু পুস্তক প্রকাশিত করিতেন। এই সভাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্তৃত্ব ছিল। তিনি পুস্তকসকলের পাণ্ডুলিপির অনুমোদন করিতেন।

স্বগ্রামের উন্নতি-সাধন

জন্মস্থান বীরসিংহের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুগভীর অনুরাগ ছিল। এই সময়ে শিক্ষা-বিস্তারের যে প্রয়াস চলিতেছিল বীরসিংহ তাহার গণ্ডী হইতে বহির্ভূত থাকিবে, ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রেত ছিল না। সেইজন্য ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বীরসিংহে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। তিনি নিজ অর্থে বিদ্যালয়ের জন্য ভূমি ক্রয় ও বাটী নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে তথায় একটি বালিকা-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই দুই বিদ্যালয়ের ব্যয়-ভার তিনি স্বয়ং বহন করিতেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতন ১৫০৲ টাকা হইতে একেবারে ৩০০৲ টাকা হয়। এই সময়ে তাঁহার পুস্তকাদি হইতেও মাসিক প্রায় ৪০০৲ টাকা আয় হইত। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ৭০০৲ টাকা হইতে এক পয়সাও সঞ্চয় করিতেন কি না সন্দেহ। কারণ, বীরসিংহের স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদির জন্য তাঁহাকে প্রতি মাসেই প্রায় পাঁচশত সাড়ে পাঁচশত টাকা ব্যয় করিতে হইত।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্টের আদেশে মফস্বলে বাঙ্গালা ও ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন ও কি প্রণালীতে তথায় শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক রিপোর্ট লিখেন। সেই রিপোর্ট দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তাঁহাকে এসিষ্ট্যাণ্ট স্কুল-ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালী বজায় রহিল; এই পদটী হইল—উপরি; ইহার বেতন মাসিক দুই শত টাকা। সুতরাং এখন হইতে তাঁহার মোট বেতন হইল ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা। হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শন করাই তাঁহার এই অতিরিক্ত পদের কার্য্য হইল।

বিদ্যাসাগর ও নর্ম্মাল স্কুল

এই বৎসরই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় নর্ম্মাল স্কুল-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। নর্ম্মাল স্কুলে পড়িয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, সাধারণ স্কুলে শিক্ষকতা করিবার অধিকার জন্মিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুপারিশে প্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ও পরে পণ্ডিত রামকমল ভট্টাচার্য্য কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের হেড পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় প্রথমে এই পদ-গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন; পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে এই পদ গ্রহণ করেন।

স্কুল-ইনস্পেক্টরের কার্য্য

ইনস্পেক্টর হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলী, বর্দ্ধমান এবং নদীয়া জেলার অনেক গ্রামে বাঙ্গালা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বহু স্থানের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদিগকে স্কুল প্রতিষ্ঠা করিবার পরামর্শ দেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে,—বিদ্যাসাগরের সময়েই সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী পড়িবার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা হয়। নিয়ম হইয়াছিল—পরীক্ষার সময়ে সংস্কৃতেও যেরূপ নম্বর রাখিতে হইবে, ইংরেজীতেও সেইরূপ নম্বর রাখা চাই। এই সময়ে ইংরেজী-পাঠের ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি ভাল ভাল ইংরেজি শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীনাথ দাস, প্রসন্ন-কুমার সর্ব্বাধিকারী, তারিণী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার আমলে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন।

বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না' শীর্ষক এক পুস্তিকা রচনা করিয়া প্রকাশিত করেন। তাহাতে তিনি যে বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী, ইহা জনসাধারণে জানিতে পারে। বস্তুতঃ তিনি বাল্যকাল হইতেই

হিন্দু বাল-বিধবাগণের দুঃখে দুঃখিত ছিলেন। সেইজন্য বাল্যকাল হইতেই তিনি উহাদিগের দুঃখ দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন। কেন বালবিধবাগণের প্রতি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের করুণা উথলিয়া উঠিল সে সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং তাঁহার স্বগ্রামবাসী জনৈক ভদ্র-লোককে যাহা বলিয়াছিলেন, ভদ্রলোক তাহার বিবরণ এইরূপ দিয়াছেন—"বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটী বাল্য-সহচরী ছিল। এই সহচরী তাঁহার কোন প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। বালিকাটী বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সর্ব্বদা থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তখন বালিকার বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটী বিধবা হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটীতে বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বাড়ী যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কে কি খাইল? ইহাই তাঁহার স্বভাব ছিল। এবার গিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার বাল্য-সহচরী কিছু খায় নাই; সেদিন তাহার একাদশী; বিধবাকে খাইতে নাই। এ কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল, বিধবার এ দুঃখ মোচন করিব; যদি বাঁচি, তবে যাহা হয় একটা করিব। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ১৩।১৪ বৎসর মাত্র হইবে।"

সুতরাং এই সঙ্কল্প যে তিনি পরিণত বয়সে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি? শুনা যায়, পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে তাঁহার প্রত্যক্ষ ইষ্টদেবতা পিতা-মাতার অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তাঁহারা তাঁহারই সঙ্কল্পের অনুকূলে মত দিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র ৺আনন্দকৃষ্ণ বসু

বলিয়াছিলেন, "কোনও বালিকা বিধবা হইয়াছে বলিলে বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল হইতেন। এই জন্য তাঁহাকে বলিতাম, "তুমি কি ইহার কোন উপায় করিতে পার না?" তাহাতে তিনি বলিতেন, "শাস্ত্রপ্রমাণ ভিন্ন বিধবা বিবাহ প্রচলন করা দুষ্কর; আমি শাস্ত্র-প্রমাণ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

বিধবা-বিবাহ-অন্দোলন

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধারণা ছিল,—তাঁহার দেশবাসীদিগের প্রাচীন শাস্ত্রের প্রতি যেরূপ অনুরাগ তাহাতে যদি শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা বিধবা-বিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে লোকে তাঁহার প্রদর্শিত পথে গমন করিবে। কিন্তু তাঁহার এই ধারণার ভ্রম তিনি পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বিধবাগণের বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ইহা প্রমাণিত হইলেও লোক-ভয়, সমাজ-ভয়, দেশাচার বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে অটল পর্ব্বতের মত বিদ্যমান ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে এই দেশাচারের বিষয় ভাবিয়া দেখেন নাই। তাঁহার বিধবা-বিবাহ বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইবামাত্র দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। চারিদিকে হুলস্থুল বাধিল। হাটে বাজারে, পথে ঘাটে, যেখানে সেখানে এই চর্চ্চা। প্রাচীন-পন্থীরা তাঁহাকে পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, দেশের শত্রু, ধর্ম্মের শত্রু ইত্যাদি নানাপ্রকার কটূক্তি করিতে লাগিল। দেশে প্রবল ঝড় বহিল। দ্বারে দ্বারে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল—যে বিদ্যাসাগরের সহিত আহার করিবে অথবা তাঁহার মতে যাইবে, তাহাকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত করা হইবে। কিন্তু বীর বিদ্যাসাগর ইহাতে একটুও বিচলিত হইলেন না। দেশ একদিকে, সমাজ একদিকে, অন্যদিকে বিরাট পুরুষ বিদ্যাসাগর। তিনি কিছুতেই তাঁহার সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না।

এই দেশাচারের শক্তি সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন,

—"বিদ্যাসাগর তর্কযুদ্ধে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে অতি অল্পসংখ্যক লোকেই অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। অতএব দেখিতেছি, কেবল শাস্ত্রীয় বচনে কুলাইতেছে না; আরও এমন কিছু দিতে হইবে, লোকে লোকভয় অতিক্রম করিতে যাহাতে পারে।" কিন্তু লোক লোকভয় অতিক্রম করিতে পারিল না। বিধবা-বিবাহের উপকারিতা বুঝিয়াও লোকে উহার সমর্থন করিতে সমর্থ হইল না! এইজন্যই পরিশেষে নিতান্ত ক্ষোভের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং লিখিয়াছিলেন,—"ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্ত-দিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিত-বোধের গতিরোধ করিয়াছিস্, ন্যায়ান্যায়-বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে, ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিক রক্ষাগুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর দোষ-স্পর্শ-শূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিক রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ, সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন।"

যাহারা বিদ্যাসাগরকে অধার্ম্মিক, নাস্তিক, দেশদ্রোহী বলিয়া গালি দিয়াছিল, তাহারা যে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ, বিদ্যাসাগর শাস্ত্রের সহায়তা লইয়াই এই সংস্কার সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি লোকভয়—সমাজভয় গ্রাহ্য করেন নাই।

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ-প্রচলন-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে স্বর্গীয় যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছিলেন,—"বিদ্যাসাগরের * * অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ তাঁহার বিধবা-বিবাহ-প্রচার। সকল মহাপুরুষের জীবনের এক একটী লক্ষ্য থাকে, সেই লক্ষ্য-সাধনের জন্যই ভগবান্ তাঁহাদিগকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগরের ইহলোকে আবির্ভাবের মূল কারণ বিধবা বিবাহ-প্রচার। ভারতের আড়াই কোটী হিন্দুবিধবার নীরব ক্রন্দনে ভগবানের আসন টলিয়াছিল—তাই তিনি হিন্দুবিধবাদের দুঃখমোচন করিবার জন্য বিদ্যাসাগরকে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরকে এই গুরুতর, কার্য্যের উপযোগী সমস্ত গুণে বিভূষিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অনন্ত দয়া, অবিচলিত অধ্যবসায়, অটল সাহস, নির্ভীক সরলতা এবং সুদৃঢ় দেহ—সংস্কার-কার্য্যের উপযোগী এ সমস্ত গুণে বিধাতা তাঁহাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন। যে দেশে যুবতী কন্যাকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিতে উপদেশ দিয়া, পিতামাতা পার্শ্বের ঘরে সুখে রাত্রিযাপন করিতে কুণ্ঠিত হন না, তাহাকে নিরামিষ ভোজন করিতে উপদেশ দিয়া আপনারা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়াদি ভোজন করা অসঙ্গত মনে করেন না;—তাহাকে নিরাভরণা ও গৈরিকবসনা করিয়া নিজেরা বসন বা ভূষণে ভূষিত হইতে লজ্জাবোধ করেন না;—সে দেশে বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিধবার দুঃখে কাঁদিল কিরূপে? ভগবদনুপ্রেরণা ব্যতীত ইহার মীমাংসা করিব কিরূপে? নিশ্চয়ই হিন্দুবিধবার দুঃখ দূর করিবার জন্য এ হৃদয়শূন্য—কপটাচারী —নিরীশ্বর ও নির্জ্জীব ভারতে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থ এই ভগবদুদ্বোধনার ফল, সন্দেহ নাই। ইহার প্রতি ছত্রে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, অখণ্ড যুক্তি ও অসীম বিশাল-হৃদয়তা মাখান রহিয়াছে। তাঁহার কোনও পুস্তক ইহার মত মূল্যবান্ নহে। যদি সুলেখক ও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া কোনও পুস্তকের

দ্বারা তিনি অধিক পরিচিত হইয়া থাকেন ত সে এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থ দ্বারা ভারতে একটী যুগ-পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।”

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর বিদ্যাসাগর মহাশয় এক হাজার লোকের স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন। উদ্দেশ্য—বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আইন প্রবর্ত্তিত হউক। ঐ খৃষ্টাব্দেরই ১৭ই নভেম্বর মান্যবর গ্রাণ্ট সাহেব আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১২শে জানুয়ারী এই পাণ্ডুলিপি সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হয়। ১৭ই মার্চ্চ ইহার বিরুদ্ধে প্রায় ছত্রিশ হাজার হিন্দুর স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র প্রেরিত হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ১৮৫৬-খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হইয়া যায়।

আইন পাশ হইবার পর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর বা ১২৬৩ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ ভবনে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা-বিবাহ করেন। এই বিবাহ-সভায় তদানীন্তন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বয়ং বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার অন্যতম সভ্য মনোনীত হন। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত শিক্ষা উঠাইবার প্রস্তাব হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় একাকী অন্যান্য সভ্যদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। শেষে তিনিই জয়ী হন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে “এডুকেশন কাউন্সিলে”র স্থানে বর্ত্তমান “পাব্লিক ইনষ্ট্রাকশনে”র প্রতিষ্ঠা হয়, ডিরেক্টরের পদ-সৃষ্টিও তখন হয়। গর্ডন ইয়ং নামক এক নবীন সিবিলিয়ান প্রথম ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

ছোট লাট হ্যালিডে সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েক মাস ইয়ং সাহেবকে শিক্ষাবিভাগের কার্য্য শিক্ষা দেন। হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রভূত সম্মান করিতেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে তিনি হ্যালিডে সাহেবের বাটীতে গিয়া সাক্ষাৎ করিতেন। তিনি চটিজুতা পায়ে দিয়া ও মোটা চাদর পরিয়া ছোটলাট সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইতেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় হ্যালিডে সাহেবের কথায় বহু স্থানে বহু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। এইসকল বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ মাসিক বেতনের জন্য 'বিল' করিয়া পাঠাইলে শিক্ষাবিভাগের নূতন ডিরেক্টর ইয়ং সাহেব তাহা মঞ্জুর করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি অবিলম্বে এই ব্যাপার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবের গোচর করেন। কিন্তু ছোটলাট বাহাদুর তাহার কোনও প্রতিকার করিলেন না; বরং বলিলেন, আপনি নালিশ করিয়া টাকা আদায় করুন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা করেন নাই। তিনি ঋণ করিয়া শিক্ষকদিগের প্রাপ্য বেতনের টাকা মিটাইয়া দেন। এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইয়ং সাহেবের মনোবাদ হয়। ক্রমে ইহা প্রবল হইয়া উঠে শুনা যায়, ইয়ং সাহেব সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

সরকারী চাকুরী ত্যাগ

স্পেশ্যাল ইনস্পেক্টর হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে রিপোর্ট লিখিতেন, ইয়ং সাহেব তাহার সম্বন্ধে আপত্তিকর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। হ্যালিডে সাহেবের নিকটে অভিযোগ করিয়াও কোনও ফল হইল না। কাজেই তেজস্বী বিদ্যাসাগর আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য

৫০০৲ টাকা বেতনের প্রিন্সিপাল ও ইনস্পেক্টর-পদ পরিত্যাগ করেন। তখনকার দিনে ৫০০৲ টাকার চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়া লোক অসম্ভব মনে করিত। কিন্তু আত্মমর্য্যাদার জন্য বিদ্যাসাগর অবহেলায় তাহা কার্য্যতঃ দেখাইয়া দিলেন। হ্যালিডে সাহেব পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগরের পদ-পরিত্যাগ-পত্র পাইয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাখ্যান করিবার অনুরোধ পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি এই চাকুরী পরিত্যাগ করেন; তার পর আর তিনি চাকুরী করেন নাই। তখন তাঁহার বয়স ৩৭ বৎসর মাত্র। যে বয়সে লোকে হয় ত চাকুরী আরম্ভ করে, বিদ্যাসাগর বিদ্যা, বুদ্ধি, শ্রমশীলতা, কার্য্যপটুতা ও তেজস্বিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ৫০০৲ টাকার চাকুরী ফুৎকারের মত ত্যাগ করিয়া স্বাধীন জীবিকা আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি ধনবান্ নহেন, বিধবা-বিবাহের আয়োজনে বিষম ঋণগ্রস্ত। মাত্র তাঁহার রচিত পুস্তকাদির কিছু কিছু আয় ছিল মাত্র। তাঁহার কোনও বন্ধু পাটোয়ারী বুদ্ধির পরামর্শ দিলে তিনি সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "বরং মুদীর দোকান করিয়া খাইব, তথাপি আত্মসম্মান হারাইয়া পাঁচ শত টাকার চাকুরী করিব না।"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদ-পরিত্যাগে তাঁহার পরিচিত সরকারী কর্ম্মচারিগণ দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী স্যর সিসিল বীডন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। কারণ, বাঙ্গালার মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি ও বিশ্বাসের পাত্র হইয়াছিলেন।

মহারাণীর ঘোষণা-পত্রের অনুবাদ

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ দমিত হয়। সেই সময়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর হস্ত হইতে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তদুপলক্ষে মহারাণীর ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়। সিসিল সাহেব এই ঘোষণাপত্রের বঙ্গানুবাদের ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রদান করেন। তিনিও ঘোষণাপত্রের বঙ্গানুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন।

ওকালতির প্রবৃত্তি-ত্যাগ

বিদ্যাসাগর মহাশয় পদত্যাগ করিলে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি কলভিন্ সাহেব তাঁহাকে ওকালতি করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় তাৎকালিক উকীল দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয়ের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ওকালতির প্রবৃত্তি ত্যাগ করেন। তিনি বলিতেন, ভাল উকীল হইতে হইলে নথীপত্রের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে হয়; অন্য কর্ম্মের অবসর পাওয়া যায় না।

পিতামহীর মৃত্যু

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল-পদ পরিত্যাগ করিবার অল্প কয়েক দিন পরেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতামহী স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে বহু অর্থ বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যয় করিয়াছিলেন। বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তক বলিয়া শ্রাদ্ধে শত্রুপক্ষ বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই।

স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন

অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বাধীনভাবে উপার্জ্জনের পথ অবলম্বন করেন। এ পক্ষে তাঁহার সংস্কৃত প্রেস ও সংস্কৃত বুক ডিপজিটরীই প্রধান ভরসাস্থল হইয়াছিল। প্রেসে স্বরচিত ও অপর ব্যক্তিগণের রচিত পুস্তক ছাপা হইত এবং ডিপজিটরীতে নিজের ও অপরাপর ব্যক্তির পুস্তক বিক্রয় হইত। ছাপাখানায় ও পুস্তকের দোকানে বেশ লাভ হইত। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদ্যাসাগর মহাশয় মাসিক

১৫০৲ টাকায় ডিপজিটরীতে রাখিয়াছিলেন। ইহাতেই ডিপজিটরীর আয়ের পরিমাণ বুঝিতে পারা যায়।

বিধবা-বিবাহ-ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভূত ঋণ হইয়াছিল কিন্তু তিনি ইহা পরিশোধ করিয়াছিলেন।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইলে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় পাঁচ হাজার টাকায় উহার স্বত্ব ক্রয় করেন। কিন্তু বেশী দিন এই কাগজ তিনি চালাইতে পারেন নাই। অতঃপর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি কাগজ পরিচালনের ভার দেন। বিদ্যাসাগর কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়কে উপযুক্ত মনে করিয়া 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদক নিযুক্ত করেন। ক্রমে কৃষ্ণদাস ইহার স্বত্বাধিকারীও হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার এক কপর্দ্দকও লাগে নাই।

সোমপ্রকাশ ও বিদ্যাসাগর

প্রিন্সিপাল-পদ ত্যাগ করিবার দুই বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল বিপন্নের সাহায্যের জন্য "সোমপ্রকাশ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় নামক সংস্কৃত কলেজের এক কৃতী ছাত্রের দৈব-বিড়ম্বনায় শ্রুতি-শক্তি নষ্ট হয়। সারদাপ্রসাদ ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। একদিন সারদাপ্রসাদ আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিল,—"আমার সংসার আর চলে না।" তিনি ইহার দুঃখ-নিবারণের জন্য "সোমপ্রকাশ" বাহির করেন। পরে এই সারদাপ্রসাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুপারিশে বর্দ্ধমান রাজবাটীতে মহাভারতের অনুবাদকার্য্যে ও লাইব্রেরীয়ান্-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। "সোমপ্রকাশে" বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং লিখিতেন; সময়ে সময়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ও লিখিতেন। কিন্তু

তাহা হইলেও নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিবার জন্য "সোমপ্রকাশ"-প্রকাশে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাদৃশ যত্ন লইতে পারিতেন না। অবশেষে তিনি পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহারই হস্তে "সোমপ্রকাশ" সমর্পণ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুবৎসল ও বিপন্নের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার দয়ার পাত্রাপাত্র ছিল না। লোকের বিপদ-আপদ বা দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না; অবিলম্বে দুঃখমোচনের ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এজন্য যদি ঋণ করিতে হইত তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাসাগরের জীবনে ৫০হাজার টাকার অধিক ঋণ হইয়াছিল; কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি এক কপর্দ্দকও ঋণ রাখিয়া যান নাই।

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সাহায্য-দান

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ উকীলের মোক্তার তাঁহার জমি-জমার পত্তনি লইয়াছিলেন। জনৈক রাজা বাহাদুর সেই পত্তনি-দারের নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া মাইকেলকে বিলাতে পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মাইকেল বাব কতক তাঁহার নিকট হইতে টাকা পাইয়াছিলেন। তার পর বার বার চিঠি লিখিয়াও টাকা পান নাই। বিদেশে অর্থাভাবে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল, এমন কি কারাবাসেরও উপক্রম ঘটিয়াছিল। এই বিপদের সময়ে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অর্থসাহায্য চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি মাইকেলের চিঠি পাইয়া তদ্দণ্ডে ৬০০০৲ টাকা ধার করিয়া সেই টাকা মাইকেলকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার নিজের হাতে তখন এক কপর্দ্দকও ছিল না। বিদ্যাসাগরের টাকায় মাইকেলের জীবন ও সম্মান উভয়ই রক্ষা পাইয়াছিল। তাই বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছিলেন;

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে! পেয়ে সে মহাপর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরীশ! কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!—
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃতফল পরম আদরে
দীর্ঘশির তরুদল, দাসরূপ ধরি';
পরিমল ফুল-কুল দশ দিশ ভরে'
দিবসে শীতলশ্বাসী ছায়া, বনেশ্বরী
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।"

(চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী)

মধুসূদনের ঋণমুক্তিতে বিদ্যাসাগর

মাইকেল মধুসূদন দত্তকে একবার নহে, বার বার তিনি ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন। কবিবর মাইকেল অনেক সময়ে তাঁহার নিকট হইতে টাকা কাড়িয়া পর্য্যন্ত লইয়া যাইতেন।

ঋণগ্রস্তদিগের উদ্ধার-সাধন

বিদ্যাসাগর করুণার সাগরই ছিলেন। তিনি বহু বিপন্ন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয় কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন;—

(১) ক্ষীরপাই রাধানগর-নিবাসী রামকমল মিত্র এবং গঙ্গাদাসপুর-নিবাসী গোরাচাঁদ দত্ত, গঙ্গাপুর-নিবাসী তারাচাঁদ সরকারের ৫০০৲

টাকা ধারিতেন। তারাচাঁদ উভয়ের নামে নালিশ করিয়া 'ডিক্রী" পান। পরে ঐ দুইজন দেনাদার ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। ইঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলে ৫০০৲ টাকা নিজ জামিনে অপরের নিকট হইতে ঋণ দেওয়াইয়া ইঁহাদিগকে বিপন্মুক্ত করেন। কিন্তু পরে এই টাকা ইঁহারা পরিশোধ করেন নাই। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই টাকা পরিশোধ করিতে হইয়াছিল।

(২) একবার পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ৫০০৲ টাকার জন্য বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন তিনি বিদ্যাসাগরমহাশয়ের নিকট কাঁদিয়া কাঁটিয়া পড়েন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ৫০০৲ টাকা ধার করিয়া তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ইহার পরে তর্কালঙ্কারের সহিত আর তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

(৩) এক সময় জাহানাবাদের নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রাম-নিবাসী এক ব্রাহ্মণ দুই শত টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। পাওনাদারদিগের তাগাদার চোটে তিনি উদ্ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে এই টাকা দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ছাত্রগণকে সাহায্য-দান

এইরূপ সাহায্যদান ব্যতীত বহু দরিদ্র ছাত্র তাঁহার নিকট মাসিক বৃত্তি পাইত। অনেক দরিদ্র লোককে বিদ্যাসাগর অর্থসাহায্য করিতেন। কলিকাতা সহরে তখন বিপন্নের বন্ধু, আর্ত্তের ত্রাণকর্ত্তা কে ইহা বলিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই লোকে নির্দ্দেশ করিত।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অপার করুণার আর একটি দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগরের জীবনী-রচয়িতা স্বর্গীয় বিহারিলাল সরকারের গ্রন্থে এইরূপ আছে :— "একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় একটী বন্ধুর সহিত কলিকাতায় সিমলা-হেদুয়ার নিকট পাদচারণ করিতেছিলেন। সেই সময় একটী ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া অতি বিষণ্ণভাবে তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন।

ব্রাহ্মণের চক্ষে জল পড়িতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আপনি কাঁদিতেছেন কেন?" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটিজুতা ও মোটা চাদর দেখিয়া, সামান্য লোকবোধে, ব্রাহ্মণের কোন কথাই বলিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে তিনি বলেন,—"আমি এক ব্যক্তির নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া, কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি; কিন্তু সে টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম। ঋণদাতা আদালতে আমার নামে নালিশ করিয়াছে।" ব্রাহ্মণকে বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন,—"মোকদ্দমা কবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"পরশ্ব।" ক্রমে ক্রমে বিদ্যাসাগরমহাশয় মোকদ্দমার নম্বর, ব্রাহ্মণের নাম, ধাম প্রভৃতি একে একে সব জানিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে পর তিনি সঙ্গী বন্ধুটীকে মোকদ্দমার প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে বলেন। তথ্যানুসন্ধানে ঠিক হয়, ব্রাহ্মণের কথা সত্য বটে। দেনা তাঁর সুদে আসলে ২৪০০ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয় ২৪০০ টাকাই আদালতে জমা দেন। তিনি আদালতের উকিল-আমলাকে বলিয়া রাখেন,—"আমার নাম যেন প্রকাশ না পায়।"

'মেট্রোপলিট্যান'-প্রতিষ্ঠা

মেট্রোপলিট্যান ইনষ্টিটিউসন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি। "ট্রেণিং স্কুলে"র চিতা-ভস্মের উপর এই মেট্রোপলিট্যান ইনষ্টিটিউসন প্রতিষ্ঠিত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিট্যানের ভার একাকী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে নিপতিত হয়। তৎপূর্ব্বে ইহার পরিচালনভার একটী কমিটির হস্তে ছিল ও বিদ্যাসাগর সেই কমিটির সদস্য ছিলেন। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের হাতে পড়িয়া মেট্রোপলিট্যান শীঘ্রই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-সমূহের মধ্যে প্রশংসনীয় স্থান অধিকার করে। স্কুল-বিভাগে সাফল্য অর্জ্জন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মেট্রোপলিট্যানে কলেজ-

বিভাগ খুলেন। প্রথমে এফ-এ, পরে বি-এ শ্রেণী খুলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বল্পব্যয়ে মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানগণের উচ্চশিক্ষালাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে এই মেট্রোপলিট্যান ইনষ্টিটিউশন ও কলেজ বিদ্যাসাগর স্কুল ও কলেজ নামে অভিহিত হইয়া তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তির স্মারকরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকরণ-কৌমুদীর চতুর্থ ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আখ্যানমঞ্জরীর প্রথমভাগ প্রণীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

বেথুন স্কুল ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্য বেথুন স্কুলের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ১২৭১ সালের ১লা চৈত্র বা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ বেথুন বিদ্যালয়ের পারিতোষিকের সময়ে তিনি এক ছড়া সোনার চিক উপহার দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে এইরূপ পারিতোষিক দিতেন। ক্রমে বেথুন স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি বিদ্যাসাগরমহাশয়ের অননুমোদিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বেথুন স্কুলের সেক্রেটারীর পদ পরিত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর-পিতার কাশীবাস

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা কাশীবাসী হন। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই :—"পিতার কাশীবাস করিবার প্রস্তাব শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাড়ী যান। তথায় নির্জ্জনে তিনি পিতাকে বলেন,—"আপনি কাশীবাসী হইবেন কেন? যদি পুণ্যার্থে যান, তবে কথা নাই; যদি সংসার-বৈরাগ্যে যান, তাহাতেও কথা নাই; কিন্তু সুখে স্বচ্ছন্দে

সংসার চালাইবার উপযুক্ত টাকা পান না বলিয়া যদি যান, তাহা হইলে, আমি টাকার বন্দোবস্ত করিতে পারি।" পিতা বলিলেন,—"পুণ্যার্থেই যাইব।" বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিরুক্তি করেন নাই।"

পিতাকে কাশীতে পাঠাইবার পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করাইয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার ৩০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার পরে তিনি জননীরও তৈলচিত্র অঙ্কিত করাইয়া লইয়াছিলেন।

দুর্ভিক্ষে অন্নসত্র-স্থাপন

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সময়ে বহুলোক অনশনে মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল। বহু দীন-দুঃখী পেটের জ্বালায় গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছিল। বিদ্যাসাগর এই সংবাদ পাইয়া নিজ গ্রামে অন্নসত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার করুণাময়ী জননী অন্নদান আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি বীরসিংহ গ্রামে প্রত্যহ চারি পাঁচ শত লোককে খাওয়াইতেন। বিদ্যাসাগর যে অন্নসত্র বীরসিংহ গ্রামে খুলিয়াছিলেন তাহাতে বীরসিংহ ও নিকটবর্ত্তী ১০।১২খানি গ্রামের বহু নিরন্ন লোক অন্ন পাইত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্নসত্রে যাহারা আহার না করিত, তাহারা প্রত্যহ সিধা পাইত। কোন দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ব্যক্তি সন্তান ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইলে তাহার পরিত্যক্ত সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিদ্যাসাগরমহাশয় স্বয়ং গ্রহণ করিতেন। গর্ভবতী স্ত্রীলোক প্রসব করিলে নবজাত সন্তানের জীবন-রক্ষার ও পালনের ভারও তিনি লইতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্নসত্রে দরিদ্রেরা প্রত্যহ খেচরান্ন পাইত। প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করিয়া ভাত, মাছের ঝোল ও দধির ব্যবস্থা ছিল। এমন অনেক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক ছিলেন, যাঁহারা সিধা লইতে কুণ্ঠিত

হইতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় গোপনে তাঁহাদিগকে টাকা দিতেন। বহু ভদ্রমহিলাকে তিনি গোপনে কাপড় বিতরণ করিয়া আসিতেন। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের অন্নসত্রে রোগীর চিকিৎসা হইত, মৃতের সৎকার ব্যবস্থা ছিল। পৌষ মাস পর্য্যন্ত এই অন্নসত্রে কার্য্য চলিয়াছিল পরে উহার প্রয়োজনীয়তা চলিয়া গেলে অন্নসত্রের কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

অন্নকষ্টের অবসান হইলেও গ্রামের যে সকল লোকের অবস্থা মন্দ ছিল তিনি তাঁহাদিগকে মাসিক কিছু কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর জননী স্বয়ং এই সাহায্য-দানের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর—দয়ার সাগর

বিদ্যাসাগর এতদিন বিদ্যারই সাগর বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এইবার তিনি 'দয়ার সাগর' বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট ঘোষিত হইলেন। লোক বলিতে লাগিল—"বিদ্যাসাগর—দয়ার সাগর" অথবা "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।" দুর্ভিক্ষের সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই সাহায্যদানের বিবরণ তাঁহার ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এইরূপ এইরূপ প্রদান করিয়াছেন :—"ইতিমধ্যে গড়বেতার অন্নসত্রের কর্ম্মাধ্যক্ষ বাবু হেমচন্দ্র কর ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ সাহায্যপ্রার্থনায় অগ্রজ মহাশয়কে পত্র লিখিলেন। তাহাতে অগ্রজ মহাশয় আমার দ্বারা দরিদ্র-ভোজনের ৫০৲ টাকা, আর উহাদের বস্ত্রের জন্য ৫০৲ টাকা, একুনে ১০০৲ টাকা প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত ঐ সময়ে কোনও কোনও ভদ্রলোক পিতৃহীন অবস্থায় যাচ্ঞা করিতে আইসেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও ৫০৲ টাকা কাহাকেও ১০০৲ টাকা, কাহাকেও ২০০৲ টাকা দান করেন। ২৮শে শ্রাবণ পৃথক বাটীতে অন্নসত্র স্থাপিত হয়। ১লা পৌষ ভোজনের পর অন্নসত্র বন্ধ করা হইয়াছিল; কিন্তু

বিদেশীয় নিরুপায় ব্যক্তিগণ ৮ই পৌষ পর্য্যন্ত অন্নসত্রগৃহে উপস্থিত ছিল। এ কারণ দুর্ব্বল নিরুপায় প্রায় ৬০ জনকে কয়েক দিবস ভোজন করাইতে হইয়াছিল।”

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুবৎসল ছিলেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়সমূহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সহায়ক ছিলেন; বিধবা-বিবাহ ব্যাপারেও রাজা বাহাদুর তাঁহাকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যু হইলে এই পাইকপাড়া রাজ-পরিবারের অবস্থা বৈগুণ্য ঘটিয়াছিল। বিদ্যাসাগরমহাশয়কে এই সময়ে রাজা প্রতাপ সিংহের পিতামহী রাণী কাত্যায়নী অনুরোধ করেন যে, তিনি পাইক পাড়া এষ্টেটকে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিউন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তদানীন্তন ছোটলাট স্যর সিসিল বিডনকে অনুরোধ করিয়া পাইকপাড়া এষ্টেটকে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এ ব্যবস্থায় এষ্টেটটী রক্ষা পাইয়াছিল, একবার কালেকটরীর বাকী খাজনার দায়ে এষ্টেট নিলামে বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, সে বারও বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাটকে অনুরোধ করিয়া এষ্টেটকে নিলামে বিক্রীত হইবার দায় হইতে রক্ষা করেন। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের এইরূপ বন্ধুবৎসলতার নিদর্শন বিস্তর আছে।

দরিদ্র বন্ধুর মর্য্যাদা-রক্ষা

বিদ্যাসাগর যখন যশঃ ও মানের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন, যখন লাট-বেলাট পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পাইলে আপনাদিকে ধন্য মনে করিতেন, সেই সময়েও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদমর্য্যাদার অভিমান ছিল না। সাধারণ দরিদ্র মূর্খ লোক পর্য্যন্ত আহবা ন

করিলে তিনি বিনা অভিমানে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। পরন্তু কোনও ধনীর আহ্বানে আত্মসম্মানে কিছুমাত্র আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা দেখিলে তিনি সে আহ্বান গর্ব্বভরে প্রত্যাখ্যান করিতেন। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত-রচয়িতা স্বর্গীয় বিহারিলাল সরকার মহাশয় নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রদান করিয়াছেন ঃ—

"বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায়ই পাইকপাড়া রাজবাটীতে যাইতেন। একদিন পথিমধ্যে তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিত রামধন নামে মুদি তাঁহাকে ডাকিয়া আপনার দোকানে লইয়া যান। রামধন বিদ্যাসাগরমহাশয়কে খুড়া খুড়া বলিয়া ডাকিত। রামধনের সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অম্লানবদনে তাঁহার দোকানের সম্মুখে ঘাসের উপর বসিয়া থেলো হুকায় তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় রাজ-বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলে কেহ কেহ এ কথার উল্লেখ করেন। "এটা ভবাদৃশ জনোচিত নহে" বলিয়া একটা মৃদু তীক্ষ্ণ মন্তব্যও প্রকটিত যে না হইয়াছিল, এমন নহে ; বিদ্যাসাগর মহাশয়, কিন্তু ধীর-গম্ভীর বাক্যে অথচ একটু মৃদুমন্দ হাস্যে বলিয়াছিলেন, 'গরিব বড় মানুষ আমার সবই সমান।"

বিদ্যাসাগর ও দ্বারবান

কোনও সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় পাইকপাড়ার রাজবাটীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে এক ভিক্ষুক রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা চাহে। দ্বারবানেরা ভিক্ষুককে তাড়াইয়া দেয়। বিদ্যা-সাগর মহাশয় ইহা দেখিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোনও কোনও বন্ধু তাঁহাকে বলেন,— আপমি বাড়ীর দরজায় দরোয়ান বসাইয়া রাখুন। বিদ্যাসাগর ইঁহা-দিগকে পাইকপাড়ার রাজবাড়ীর দ্বারবানদের কথা শুনাইয়া দিয়া বলিতেন,—"দরোয়ান রাখিলে আমার বাড়ীতে ভিখারীরা এক মুঠা

ভিক্ষা পাইবে না, আমার সঙ্গে যাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসেন তাঁহাদের অনেকে অপমানিত হইবেন, হয়ত আমার দেখা সকলে পাইবেন না, আমি গরীব ব্রাহ্মণ—আমার এ সব উপসর্গে কাজ কি? দরোয়ান রাখার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল। দবোয়ান রাখার যে কি অসুবিধা তাহা আমি অন্যের বাড়ীতে দেখিয়া আসিয়াছি, সে অসুবিধা আমার বাড়ীতে ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি?"

বিদ্যাসাগর ও সাক্ষাৎপ্রার্থী

"বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সাক্ষাৎকার-লাভের পক্ষে কখনও কোনও রূপ বিঘ্ন-বাধার ব্যবস্থা ছিল না।' চরিতকার বিহারীবাবু এই কথাগুলি লিখিয়া তৎসম্বন্ধে যে দুই একটি উদাহরণ দিয়াছেন সেগুলি আমরা উদ্ধৃত করিলাম:— 'তিনি যে সময়ে সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণবাবুর বাড়ীতে থাকিতেন, সেই সময় একদিন মধ্যাহ্নে এক ব্যক্তি অতি ব্যস্তভাবে তথায় উপস্থিত হন। তখন বিদ্যাসাগরমহাশয় উপস্থিত ছিলেন। লোকটি বিদ্যাসাগরমহাশয়কে চিনিতেন না। তিনি একটু বিরক্ত, একটু উগ্রভাবে বিদ্যাসাগরমহাশয়কে বলিলেন,— "বিদ্যাসাগরমহাশয় কোথায়?" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,— "কেন?" লোকটি বলিলেন,—"তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি? অনেক বড় লোকের বাড়ী যাইলাম, কেহই সাক্ষাৎ করিলেন না; দেখিয়া যাই, বিদ্যাসাগর কিরূপ!" বিদ্যাসাগর মহাশর বলিলেন— "আহার হইয়াছে?" উত্তর হইল,—"আহার কি, জলস্পর্শ হয় নাই। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন— "বিদ্যাসাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। এখন আপনি কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শান্ত হউন।" লোকটি বলিলেন,—"অগ্রে সাক্ষাৎ চাই।" ইতিমধ্যে দিব্যরূপ জলযোগ আসিল। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের অনুরোধে লোকটি জলযোগ করিলেন। পরে শান্ত হইয়া, তিনি বিদ্যাসাগরের

সাক্ষাৎকার-প্রার্থী হইলে, বিদ্যাসাগরমহাশয় আর আত্মগোপন করিতে পারেন নাই। তখন লোকটি বিদ্যাসাগরমহাশয়ের প্রকৃত মহত্বানুভব করিয়া পরম পুলকে বিদায় গ্রহণ করেন।”

“অনেকেই আবার সাক্ষাৎকার জন্য অসময়ে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের উপর উৎপাড়ন করিতেন। একবার উত্তরপাড়া হইতে কতকগুলি লোক তাঁহার বাদুড়বাগানের বাড়ীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। উদ্দেশ্য,—চাকুরী-প্রার্থনা। এই সময় বিদ্যাসাগরমহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যা সাংঘাতিক রূপ পীড়িত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপরে তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছিলেন। মন অত্যন্ত চঞ্চল ছিল। এমন অবস্থায় উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন! সেই সময় ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু মহাশয় নীচে একস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের মনের অবস্থা জানাইয়া তাঁহাদিগকে সময়ান্তরে আসিতে বলেন। তাঁহারা তাঁহার কথা শুনিলেন না; অধিকন্তু চাকরের দ্বারা বিদ্যাসাগরমহাশয়কে সংবাদ পাঠাইয়া দেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় বলিয়া পাঠান,—“অদ্য আমার মন বড়ই চঞ্চল। কন্যার কাছ-ছাড়া হইতে পারি না, আপনারা অন্য দিন আসিবেন।” লোক কয়টি একথা না মানিয়া উপরে যাইবার জন্য সিঁড়ির উপরে উঠিলেন। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় উপর হইতে নামিয়া একটু বিরক্তিসহকারে বলিলেন—“আপনারা বড়ই গরজ বুঝেন। আপনাদের কি দয়া-মায়া নাই? অদ্য যাউন, আর একদিন আসিবেন। তখন লোকগুলি অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া যান।”

“বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপরে এইরূপ উৎপীড়ন প্রায়ই হইত।” তিনি বলিতেন,—“উৎপীড়ন প্রায়ই হইত বটে কিন্তু উৎপীড়ন সহ্য করিতে অভ্যাস করিয়াছি।”

দুর্ঘটনায় স্বাস্থ্যভঙ্গ

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বিদ্যাসাগরমহাশয় উত্তরপাড়ায় বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত মিস কারপেণ্টার, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ আর্টকিনসন এবং স্কুল-ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব ছিলেন। পরিদর্শনকার্য্য শেষ হইলে সকলেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় একজন ভদ্রলোকের অনুরোধে সেই ভদ্রলোকেরই বগী গাড়ীতে আরোহণ করেন। পথিমধ্যে এই গাড়ী উল্টাইয়া যায়। বিদ্যাসাগরমহাশয় পড়িয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার যকৃতে দারুণ আঘাত লাগিয়াছিল। মিস কারপেণ্টার ও উড্রো সাহেবের শুশ্রূষায় বিদ্যাসাগরমহাশয় চৈতন্য লাভ করেন ও কলিকাতার বাসায় ফিরিয়া আসেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসায় তিনি একমাসে একরূপ সারিয়া উঠেন বটে, কিন্তু এই পতনজনিত আঘাতে তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর প্রায়ই তিনি শিরোরোগ ও উদরাময়ে কষ্ট পাইতেন। তাঁহার পরিপাকশক্তি এতই কমিয়া গিয়াছিল যে, রাত্রে সামান্য দুই এক মুঠা মুড়ি, বার্লির রুটি ইত্যাদি অত্যন্ত লঘু দ্রব্য আহার করিতেন এবং দিনের বেলা মাছের ঝোল ও ভাত। দুধ সহ্য হইত না। পতনের ফলেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃ লাভের জন্য তিনি ফরাসডাঙ্গা, বর্দ্ধমান, কানপুর প্রভৃতি স্থানে যাইতেন, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী ফল হয় নাই।

জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ

১২৭৩ সালের শ্রাবণ মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর সহিত নদীয়া জেলার আইসমালী গ্রামবাসী ৺গোপালচন্দ্র সমাজপতির বিবাহ হয়। কোনও কার্য্যোপলক্ষে

গোপালচন্দ্র কাশীধামে গিয়াছিলেন; শুনা যায়, বিদ্যাসাগরমহাশয়ই তাঁহাকে কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে ওলাউঠা রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। বিদ্যাসাগরমহাশয় ইহার বিয়োগে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন। গোপালচন্দ্রের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ ৺সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি এবং কনিষ্ঠ ৺যতীশচন্দ্র সমাজপতি। সুরেশচন্দ্র 'সাহিত্য' নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের সম্পাদক ও তীক্ষ্ণদর্শী সমালোচক ছিলেন। 'বাঙ্গালী' 'বসুমতী' প্রভৃতি সংবাদপত্রেরও সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। তিনি সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের এই দুই দৌহিত্রই বিদ্যাসাগরমহাশয়ের মৃত্যুর বহু পরে কিন্তু তাঁহাদের মাতার জীবদ্দশায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। যতীশচন্দ্র আবার সুরেশচন্দ্রের পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন।

বিধবা-বিবাহ-ব্যাপারে ঋণ

ইংরেজী ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গুজব উঠে যে, বিদ্যাসাগরমহাশয় বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে ও বিধবা-বিবাহ-ব্যাপারে বিস্তর টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। সংবাদপত্রেও এ সম্বন্ধে জনসাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। বিদ্যাসাগরমহাশয় বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া এই বিষয় জানিতে পারেন এবং জানিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিবাদ করিয়া এই মর্ম্মে এক পত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সংবাদপত্রে লিখিয়া পাঠান :—

বহুদিনের পর আমি বীরসিংহ হইতে কলিকাতায় আসিলাম। আসিয়া শুনিলাম, বিধবা-বিবাহ-ব্যাপারে আমি বিস্তর টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। এইজন্য চাঁদা তুলিয়া ঋণশোধের নিমিত্ত এক ফণ্ড-স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে বলা হইয়াছে, ৪৫ হাজার টাকা ঋণ হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঋণ ইহার অর্দ্ধেকেরও কম এবং সেই ঋণ-পরিশোধের নিমিত্ত সাধারণের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইবার ইচ্ছা কখনই আমার নাই। এইরূপ বিজ্ঞাপন আমার নামে প্রচার করিবার পূর্ব্বে আমার সম্মতি পর্য্যন্ত লওয়া হয় নাই। আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না। সেইজন্য অত্যন্ত বিস্ময় ও ক্ষোভের সহিত আমি ইহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি।

বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে বহু হিতৈষী বন্ধু যৎসামান্য অর্থসাহায্য করিয়াছেন; তাঁহাদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সাহায্য সামান্য হইলেও আমি তাহার প্রত্যাখান করি নাই। কয়েকটী বন্ধুর অর্থসাহায্যে এবং যত অল্প হউক, আমার নিজ আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই আমি এতাবৎ এই সংস্কারের পথে চলিয়া আসিতেছি। আশা আছে, এইরূপ চলিতে পারিব। উল্লিখিত কয়েকটী বন্ধু এবং স্বেচ্ছায় যাঁহারা অর্থসাহায্য করিতেছেন, তাঁহারাই আমার এই কার্য্যে সহায়।

৬০টি বিধবা-বিবাহে ৮২ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। প্রথম বিধবা-বিবাহ হয় কলিকাতা সহরে। এই বিবাহে ধূমধাম করা ও পণ্ডিত কুলীনাদির বিদায় দেওয়া বিধবা-বিবাহ-সমিতি প্রয়োজনীয় মনে করায় এই বিবাহে ১০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। মফঃস্বলেরও বিধবা-বিবাহে বহু টাকা খরচ হইয়াছে। কারণ, সামাজিক ব্যয় ব্যতীত অনেক স্থলে দেওয়ানী ফৌজদারী মামলা প্রভৃতি চালাইবার ব্যয়ও করিতে হইয়াছিল ও হইতেছে।

যাহা হউক, আমি পুনরায় নিবেদন করিতেছি,—বিধবা-বিবাহ-সম্পর্কিত ব্যাপারে আমি যে ব্যয় করিয়াছি তাহাতে আমার যতই ঋণ হউক তাহা আমি নিজ আয় দ্বারাই শোধ করিব; এজন্য সাধারণের নিকট প্রার্থী হইবার ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই। সুতরাং যাঁহারা আমার নাম করিয়া এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছেন

তাঁহাদিগকে আমি সরিয়া দাঁড়াইতে ও বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই প্রতিবাদপত্র প্রচারিত হইবার পর অবশ্য এই বিজ্ঞাপনটী উঠিয়া যায় এবং তাঁহার যেসকল বন্ধু এই বিজ্ঞাপনটী তাঁহার বিনা সম্মতিতে প্রচারিত করেন তাঁহারা অত্যন্ত লজ্জিত হন।

বর্দ্ধমান-চকদীঘির জমিদার সারদাপ্রসাদ রায় মহাশয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পরলোক গমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে তিনি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে চকদীঘিতে একটি দাতব্য ডাক্তারখানা ও ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চকদীঘির এক দরিদ্র পরিবারকে বিদ্যাসাগর মহাশয় মাসিক ১৫৲ টাকা সাহায্য করিতেন।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল অঞ্চলে একটি এণ্ট্রান্স স্কুল প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঋণগ্রস্ত অবস্থাতেও ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কিরূপ আগ্রহ ছিল তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়।

ইনকম ট্যাক্স ও বিদ্যাসাগর

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে ইনকম ট্যাক্স বা আয়কর-নির্দ্ধারণে লোকে আতঙ্কিত হইয়া বিদ্যাসাগরের শরণাগত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই কথা ছোটলাটকে বলেন। তাঁহার অনুরোধে ছোটলাট বাহাদুর বর্দ্ধমানের তদানীন্তন কমিশনার হ্যারিসন সাহেবকে ইনকম ট্যাক্সের তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত করেন। তথ্যানুসন্ধানে নির্ণীত হয় যে, প্রকৃত পক্ষে অন্যায়রূপে কর নির্দ্ধারিত হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রায় দুই মাসকাল অন্য কার্য্য ত্যাগ করিয়া এই তদন্ত-ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রায় তিন হাজার টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছিল।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ "আখ্যানমঞ্জরী" প্রণীত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

হোমিওপ্যাথি ও বিদ্যাসাগর

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বেরিণী সাহেব কলিকাতায় আসিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আরম্ভ করেন। কলিকাতার বহুবাজার অঞ্চলের ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ দত্ত ইতিপূর্ব্বে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কতকটা ব্রতী হইয়াছিলেন। ক্রমে বেরিণী সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় ও সেই পরিচয় বন্ধুতায় পরিণত হয়। বেরিণী সাহেবের সাহায্যে রাজেন্দ্রবাবু হোমিওপ্যাথিতে বিশিষ্ট দক্ষতা লাভ করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দ্বারা রাজেন্দ্রবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিরঃপীড়া, বিদ্যাসাগর-বন্ধু রাজকৃষ্ণবাবুর উৎকট মলকৃচ্ছ্রতা আরোগ্য করেন। ইহাতে বিদ্যাসাগরমহাশয় বিস্মিত হইয়া হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা আরম্ভ করেন ও বিদ্যাসাগরমহাশয়ের পরামর্শে তাঁহার ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হইয়াছিলেন।

অতঃপর বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সহিত তর্কযুদ্ধের ফলে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি হোমিওপ্যাথির গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। বলা বাহুল্য, পরীক্ষার ফলে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল হোমিওপ্যাথির অনুরাগী হইয়া পড়েন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার ইহাতে এরূপ সুনাম হইয়া পড়ে যে, বেরিণী সাহেবের নাম চাপা পড়িয়া যায়। তখন সকলেই ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকেই ডাকিত। ১৮৬৯ সালে বেরিণী সাহেকে রিক্তহস্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে বিদায় দিবার সময়ে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন, "কত সাহেব এ দেশে আসিয়া দেশে ফিরিবার সময়ে পকেট ভর্ত্তি করিয়া টাকা লইয়া যান, আপনি কিন্তু শূন্য পকেটে দেশে ফিরিতেছেন।" ইহার উত্তরে বেরিণী সাহেব বলিয়াছিলেন, "আমি

পাঁচ হাজার টাকা পকেটে করিয়া লইয়া যাইতেছি।” রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন, “সে কিরূপ?” বেরিণী সাহেব উত্তর করিলেন, “মহেন্দ্র যে হোমিওপ্যাথিতে দীক্ষিত হইয়াছে ও উহার প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, ইহারই নাম পাঁচ হাজার টাকা।”

ইহার কতিপয় বৎসর পরে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার উৎকট পীড়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় আরাম হইয়াছিল। এলো-প্যাথিক চিকিৎসায় কোনও ফল হয় নাই। এই সময় হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় হোমিওপ্যাথির পরম পক্ষপাতী হইয়া পড়েন এবং স্বয়ং উহা শিক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা যত্নশীল হন। তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য নরকঙ্কাল ক্রয় করিয়াছিলেন এবং ডাক্তার চন্দ্র-মোহন ঘোষ তাঁহাকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীতে বহুসংখ্যক হোমিওপ্যাথিক পুস্তক আছে।

ঋণ-পরিশোধ

বিধবা-বিবাহ-কার্য্যোপলক্ষে বিদ্যাসাগরমহাশয় বিলক্ষণ ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে মহারাণী স্বর্ণময়ী, পাইকপাড়া রাজপরিবার ও অন্য দুই এক স্থান হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। পরে তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রভৃতির নিকট হইতে গৃহীত ঋণের টাকা কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহের টাকার জন্য বিদ্যাসাগরমহাশয়কে সাধারণের চাঁদার উপর নির্ভর করিতে হয় নাই। তিনি স্বাবলম্বী পুরুষ-সিংহ ছিলেন। স্বকৃত ঋণের টাকা স্বীয় ক্ষমতাতেই পরিশোধ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর ও ম্যালেরিয়া

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে ম্যালেরিয়ার বিষম প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। ঘরে ঘরে লোক রোগে শয্যাগত হইল, কে কাহার মুখে জল দেয়,

তাহার উপায় নাই। কারণ সকলেই যে জ্বরগ্রস্ত। ঘরে ঘরে লোক চিকিৎসাভাবে মরিতে লাগিল। এই সময়ে বিদ্যাসাগরমহাশয় পীড়িত জনগণের চিকিৎসার্থ ডিস্পেন্সারী বা দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে লোকে ঔষধ, পথ্য ও পয়সা পাইত। প্রকাশ, তিনি প্রায় দুই হাজার টাকার কাপড় এই সময়ে বর্দ্ধমানে বিতরণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর-চরিতকার ৺বিহারিলাল সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন :—"এই সময় প্যারিচাঁদবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনেক সাহায্য করিতেন। তাঁহার উপর "ডিস্পেন্সারী"র সম্পূর্ণ ভার ছিল। কুইনাইন বড় মূল্যবান, অথচ রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছিল। এইজন্য গঙ্গানারায়ণ বাবু পরামর্শ দেন যে, কুইনাইনের পরিবর্ত্তে "সিঙ্কোনা" ব্যবহার করা হউক। বিদ্যাসাগরমহাশয় বলেন,—"গরীবের রোগ বলিয়া প্রকৃত ঔষধ ব্যবহার করিবে না; এও কি কখন হয়? দুঃখী ধনী সবারই প্রাণ তো একই; পরন্তু রোগও এক। গঙ্গানারায়ণবাবু বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বে ডুবিয়া গেলেন। যেসব রোগী ঔষধ লইবার জন্য "ডিস্পেন্সারী"তে আসিতে পারিত না, বিদ্যাসাগরমহাশয় তাহাদের বাড়াতে গিয়া, স্বয়ং ঔষধ-পথ্য দিয়া আসিতেন।"

আর্ত্ত-সেবা, দীন-দুঃখীর সেবা, পীড়িতের শুশ্রূষা—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ধর্ম্ম ছিল। তিনি দয়ার সাগর ছিলেন। মানুষের কষ্ট তিনি দেখিতে পারিতেন না।

ভ্রান্তিবিলাস

বর্দ্ধমানে এই সেবাব্রতে ব্যাপৃত থাকিবার সময়ে দুই সপ্তাহে বিদ্যাসাগরমহাশয় "ভ্রান্তিবিলাস" রচনা করেন। ইহা মহাকবি সেক্ষপীয়রের "কমেডি অফ এররস্" নামক পুস্তকের অনুবাদ।

রামের রাজ্যাভিষেক

বিদ্যাসাগরমহাশয় রামের রাজ্যাভিষেক নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। উহার ৬টী ফর্ম্মা ছাপাও হইয়াছিল কিন্তু উহা প্রকাশিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ৺শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "রামের রাজ্যাভিষেক" গ্রন্থ পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল এবং সেই গ্রন্থ দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন বলিয়া নিজ গ্রন্থের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালা ছাপাখানা

বিদ্যাসাগরমহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রণকার্য্যের সহায়তার জন্য অক্ষর-সংযোজনায় যে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার জন্য বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি যে অক্ষর-সংযোজনার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তদনুসারে আজ পর্য্যন্ত অক্ষর-যোজনা বা কম্পোজের কার্য্য চলিতেছে। এই পদ্ধতির নাম "বিদ্যাসাগরী সাট"।

পুত্রের বিধবা-বিবাহ

বিদ্যাসাগরমহাশয়ের পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট বিধবা বিবাহ করেন। বিধবা পাত্রীর নাম শ্রীমতী ভবসুন্দরী। পাত্রীর পিতার নাম ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; নিবাস খানাকুল-কৃষ্ণনগর। পাত্রীর বয়স কাহারও মতে তেরো, কাহারও মতে ষোল। এই বিবাহ করিবার পূর্ব্বে নারায়ণচন্দ্র তাঁহার পিতৃদেব বিদ্যাসাগরমহাশয়কে এই কথাগুলি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"আমার এমন গুণ নাই যে, আপনার মুখোজ্জ্বল করি তবে আপনার জীবনের মহৎ ব্রত,—বাল-বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিয়া, বাল-বিধবার ভীষণ বৈধব্য-যন্ত্রণা দূর করা। এ অধম সন্তানের তাহা অবশ্য সাধ্যায়ত্ত। আমি তাহাতে

পশ্চাৎপদ হইব না। তাহাতে আপনাকে কতকটা সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই আমার জীবন ধন্য হইবে; আর তাহা হইলে বোধ হয়, আপনার সদভিপ্রায়ের বিপক্ষবাদীরাও সন্দিহান হইতে পারিবে না।” এই বিবাহ বিদ্যাসাগরমহাশয়ের পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণের সম্পূর্ণ অমতে হইয়াছিল। তবে বিদ্যাসাগরমহাশয় ইহাতে সম্পূর্ণ অভিমতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি পাত্র ও পাত্রীকে কলিকাতায় আনাইয়া মির্জ্জাপুরে কালীচরণ ঘোষের বাটীতে এই পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া ছিলেন।

এই বিবাহে আপত্তি করিয়া বিদ্যাসাগরমহাশয়ের ভ্রাতা বিদ্যারত্ন মহাশয় বিদ্যাসাগরমহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। উহার উত্তরে বিদ্যাসাগরমহাশয় তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

“২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্ব্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবা-বিবাহ করিলে, আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন; অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে, আমার ইচ্ছায় বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবা বিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কার্য্য হইত না। আমি বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তক। আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া, কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না; ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম।

নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম এ জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবা বিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে, আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করায় আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে যাহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন; সেজন্য, নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ, অস্মদীয় ইচ্ছার অনুবর্ত্তী বা অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে।"

মেঘদূত

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় মল্লিনাথের টীকা সহ মেঘদূত মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থের প্রভূত সমাদর হইয়াছিল।

বিজ্ঞান-সভায় দান

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয় এক হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বিদ্যাসাগরমহাশয়ের পরম বন্ধু ছিলেন। দুই বন্ধুতে সামান্য কারণে মনোবিবাদ হইয়াছিল; শেষে এই বিবাদ বিদ্যাসাগর-মহাশয়ের মৃত্যুশয্যায় মিটিয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগরমহাশয় ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান-সভার অনুরাগী ছিলেন; সেই জন্য ইহার উন্নতির জন্য অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

মাতৃ-বিয়োগ

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কাশীধামে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের পিতার কঠিন পীড়া হয়। তাঁহার সেবার জন্য বিদ্যাসাগরমহাশয় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা, তৃতীয় ভ্রাতা ও জননীদেবীকে সঙ্গে লইয়া বারাণসী-ধামে গমন করেন। পিতা সুস্থ হইলে বিদ্যাসাগরমহাশয় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহার জননী কাশীধামেই অবস্থিতি করিতে থাকেন। দুইমাস কাশীবাস করিবার পর চৈত্র-সংক্রান্তির দিন বিসূচিকারোগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী লোকান্তর গমন করেন। কাশীধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যাসাগরমহাশয় স্বাস্থ্যলাভের জন্য কাশীপুরে গঙ্গাতীরে একটি বাগান-বাটী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলেন। এই বাটীতেই তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর পরলোক-গমনের সংবাদ প্রাপ্ত হন। মাতার মৃত্যুতে মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর যে কিরূপ শোকগ্রস্ত হইয়াছিলেন তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মাতার মৃত্যুর পর তিনি কয়েক মাস নিভৃতে বসিয়া অশ্রুত্যাগ করিয়াছিলেন। এক বৎসর তিনি হবিষ্যান্ন খাইয়া ছিলেন। শয্যাসন প্রভৃতি ব্যবহার করেন নাই।

পিতৃসেবা ও পিতৃবিয়োগ

বিদ্যাসাগরমহাশয়ের পিতাও শেষ জীবনে কাশীবাসী হইয়াছিলেন। পিতৃদেবের সেবার জন্য তিনি কোনও না কোনও ভ্রাতাকে তাঁহার নিকটে রাখিতেন। নচেৎ ত কোন আত্মীয়ও তাঁহার নিকটে থাকিতেন। পিতা যেসকল দ্রব্যাদি আহার করিতে ভালবাসিতেন বা ব্যবহার করিতে পছন্দ করিতেন, তিনি সেইসকল দ্রব্য কলিকাতা হইতে পাঠাইয়া দিতেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় মাতার মৃত্যুর পর দুই বৎসর কাশী যান নাই। পরে কাশীতে যাইতেন। কাশীতে যাইলে তিনি স্বয়ং রন্ধন করিয়া পিতৃদেবকে খাওয়াইতেন ও পিতার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। তিনি স্বয়ং বাজার করিয়া আনিতেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পিতার পীড়া হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া তিনি কাশীধামে গমন করেন। সেখানে দুই সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহার পিতৃদেব সুস্থ হইয়া উঠেন। কাশীধামে তিনি নিত্য দান-ধ্যান করিতেন; বহু দীন-দরিদ্র তাঁহার দানে উপকৃত হইত। বিদ্যাসাগরমহাশয় তাঁহার পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিতেন। একবার কাশীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কাশীর বিশ্বেশ্বরকে আপনি মানেন না?" বিদ্যাসাগরমহাশয় বলেন, "আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা—এই পিতৃদেব ও জননীদেবী সম্মুখে বিরাজমান রহিয়াছেন।"

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের পিতৃদেব ঠাকুরদাস কাশীধামে স্বর্গারোহণ করেন। পিতার মৃত্যুর সময়ে তিনি পিতার নিকটে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পিতৃশোকে পঞ্চম বৎসরের শিশুর মত ক্রন্দন করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরমহাশয়ের জননীদেবীও চৈত্র-সংক্রান্তিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, পিতৃদেবও

এই দিন ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। পিতার অভিলাষানুসারে তিনি কাশীধামেই পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন

হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের পাণ্ডুলিপি (Hindu Will's Act) যখন ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হয়, তাহার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের অভিমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরমহাশয়েরও অভিমত গভর্ণমেণ্ট চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যেরূপ যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এই আইনের পাণ্ডুলিপির বিরুদ্ধে করিয়াছিলেন, তাহা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। তাঁহার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াই এই আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বহু-বিবাহ-নিবারণে বিদ্যাসাগর

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বহু-বিবাহ-রহিত হওয়া উচিত কি না" শীর্ষক বিচার-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর বহুবিবাহ-নিবারণার্থ বর্দ্ধমানের মহারাজ-প্রমুখ অনেক ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন-পত্র গভর্ণমেণ্ট প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে ও তাহার পর গভর্ণমেণ্টে সে বিষয়ে কোনও রূপ প্রতিকার-ব্যবস্থা করেন নাই। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কাশীর রাজা দেবনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন, সেই সময়ে এ সম্বন্ধে আইন হইবার উদ্যোগ হয়; কিন্তু রাজা বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যগিরির কাল পূর্ণ হইয়াছিল, তিনি চলিয়া যাইলেন, ফলে আইন-প্রণয়নে ব্যাঘাত ঘটিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার তাৎকালিক ছোটলাট স্যর সিসিল বিডনের নিকটেও বহুজন-স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছিল। উহাও নিষ্ফল হইয়াছিল। অতঃপর বিদ্যাসাগরমহাশয় পতনের ফলে অসুস্থ হইয়া

পড়েন; সুতরাং বহু-বিবাহ-নিবারণ জন্য আইন-প্রণয়ন-সম্বন্ধে তিনি আর তেমন চেষ্টা করিতে পারেন নাই।

অন্যান্য কন্যার বিবাহ ও পুত্রত্যাগ

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনীর সহিত চব্বিশ পরগণা রুদ্রপুর-নিবাসী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। ইনি সব রেজিষ্ট্রার ছিলেন। অঘোরনাথেরও অকালে মৃত্যু ঘটে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জুলাই বিদ্যাসাগরমহাশয়ের তৃতীয়া কন্যার সহিত শ্রীযুত সূর্য্যকুমার অধিকারীর বিবাহ হয়। ইনি প্রথমে হেয়ার স্কুলের শিক্ষক ছিলেন; পরে মেট্রোপলিট্যান কলেজের সেক্রেটারী-পদে নিযুক্ত হন।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারীর বিবাহ হয়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরমহাশয় পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে বর্জ্জন এবং তাঁহাকে ত্যজ্য পুত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। নারায়ণচন্দ্র পিতা কর্ত্তৃক পরিবর্জ্জিত হইয়া স্বকীয় চেষ্টায় সব রেজিষ্ট্রারের কার্য্যে নিযুক্ত হন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বাদুড়বাগানের বাটী সম্পূর্ণ হয়। বাটী-নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইলে বিদ্যাসাগরমহাশয় তাঁহার লাইব্রেরীসহ এই বাটীতে উঠিয়া আসেন ও সঙ্কল্প করেন যে, তিনি একাকী এই বাটীতে থাকিবেন। কিন্তু পরে পরিবারবর্গের জন্য সুবিধাজনক অন্য বাটী পাওয়া যায় নাই বলিয়া এই বাটীতেই তিনি সপরিবারে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটি ফণ্ড

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন তারিখে "হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটী ফণ্ড" প্রতিষ্ঠিত হয়। সামান্যআয়সম্পন্ন বাঙ্গালী মৃত্যুকালে পিতা, মাতা,

বনিতা, সন্তানসন্ততি কিম্বা আত্মীয়বর্গের জন্য কোনও রূপ সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন না। যাহাতে তদ্রূপ সংস্থান হয়. তাহারই উদ্দেশ্যে এই ফণ্ডের সৃষ্টি। বিদ্যাসাগরমহাশয় ও তদীয় বন্ধুগণ যথা স্বর্গীয় দ্বা রকানাথ মিত্র, স্বর্গীয় স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, স্বর্গীয় শ্যামাচরণ দে, মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পাইকপাড়ার রাজপরিবার প্রভৃতি এই ফণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরমহাশয় এই ফণ্ডের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই ফণ্ডের কার্য্য খুব ভালই চলিতেছে এবং বহু প রিবার ইহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে ও হইতেছে।

চটি জুতা ও বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরমহাশয় থান ধুতি, মোটা চাদর ও চটি জুতা বরাবরই পরিতেন। এই পোষাকেই তিনি লাট-বেলাটের বাড়ী পর্য্যন্ত যাই-তেন। দেশী জমিদার ও রাজা-রাজড়ার বাড়ীতেও তিনি চটি জুতা পায়ে ও মোটা ধুতি-চাদর পরিয়া গমন করিতেন। ম ধ্যে মধ্যে চাপরাসী ও দরোয়ান প্রভৃতি তাঁহাকে উড়িষ্যাবাসী মনে করিয়া তাঁহার গতি-রোধ করিত। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী তারিখে এইরূপ ঘটনা "কলিকাতার মিউজিয়মে" বা যাদুঘরে ঘটিয়াছিল। বিদ্যাসাগর-মহাশয় ঐ দিন কাশীর স্বর্গীয় কবি হরিশ্চন্দ্রকে কলিকাতার যাদুঘর দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। মিউজিয়মের দরোয়ানেরা ইংরেজী জুতা-পরা কবি হরিশ্চন্দ্র ও বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সহযাত্রী রাজকৃষ্ণবাবুর দ্বিতীয় পুত্র সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিনা আপত্তিতে যাদুঘরে প্রবেশ করিতে দিল, কিন্তু বিদ্যাসাগরমহাশয়ের পরিধানে ধুতি-চাদর এবং পায়ে তালতলার চটি জুতা দেখিয়া তাঁহাকে ভিতরে যাইতে নিষেধ করিল। তাহারা স্পষ্টই বিদ্যাসাগরমহাশয়কে বলিল, "তোমার মতন একজন উড়িয়াকে জুতা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে

হইবে।" বিদ্যাসাগরমহাশয় ইহাতে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত মনে করিলেন এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি এসিয়াটিক সোসাইটীর তদানীন্তন এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বিদ্যাসাগরমহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে ভিতরে যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় বলিলেন, "আমি আর ভিতরে যাইতেছি না; আগে কর্ত্তাদের পত্র লিখিয়া জানিব, এরূপ কোনও নিয়ম আছে কি না; আর যদি থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতীকার করিতে পারি ত আসিব।" এই বলিয়া তিনি সঙ্গিগণকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসেন। অতঃপর বিদ্যাসাগরমহাশয় মিউজিয়মের কর্ত্তাদিগকে এই ব্যাপার সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছিলেন; কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। বিদ্যাসাগরমহাশয়ও আর কখনও এসিয়াটিক সোসাইটী বা যাদুঘরে পদার্পণ করেন নাই।

মেট্রোপলিট্যানে কলেজ-ক্লাস

মেট্রোপলিট্যানে বি-এ ক্লাস পর্য্যন্ত খুলিবার জন্য বিদ্যাসাগরমহাশয় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল তারিখে প্রথম আবেদন করেন। কিন্তু সে আবেদনে কোনও ফল হয় নাই। অতঃপর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী বিদ্যাসাগরমহাশয়, দ্বারিকানাথ মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল তিন জনে একত্র আবার কলেজ খুলিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট দরখাস্ত করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী অর্থাৎ ঐ তারিখেই বিদ্যাসাগরমহাশয় স্বয়ং আর একটি স্বতন্ত্র আবেদন ভাইস-চ্যান্সেলারের নিকট প্রেরণ করেন। যাহা হউক, এবারকার আবেদন মঞ্জুর হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর-চরিত-কার লিখিয়াছেন, "কলেজের জন্য বিদ্যাসাগরমহাশয়কে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ছাত্র-দিগের বেতন তিন টাকার উর্দ্ধ হইল না; অথচ অধিক বেতনের

অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে হইল। সুতরাং ঘরের অর্থব্যয় ভিন্ন আর উপায় কি ? যেরূপেই হউক, কলেজের শিক্ষা সুচারুরূপে চলিতে লাগিল। এদেশীয় ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিরা অধ্যাপনার ভার লইয়াছিলেন।”

স্বাস্থ্যভঙ্গ ও শরীর অপটু

মেট্রোপলিট্যান কলেজ-প্রতিষ্ঠাই বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্ত্তি এবং উহাই তাঁহার কাল। এই কলেজ-প্রতিষ্ঠার জন্য, উহার উন্নতিস ধনের জন্য তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেন। উত্তরপাড়া হইতে ফিরিবার পথে গাড়ী হইতে পড়িয়া যাইবার পর হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, কলেজের গুরু পরিশ্রমের ফলে তাহা আরও ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে একবাক্যে বলিলেন, “আপনি বিশ্রাম করুন; বিশ্রাম না করিলে বাঁচিবেন না।” এই সময়ে তিনি সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কর্ম্মাটার নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে একটি বাটী নির্ম্মাণ করেন ও সেই-খানে অবস্থান করিতে থাকেন। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই সাঁওতাল। ক্রমে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সহিত ইহাদের এমন প্রণয় হইল যে, উহারা বিদ্যাসাগরকে নিতান্ত আত্মীয়জন বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তিনি শীতের সময় সাঁওতালদিগকে চাদর কম্বল ইত্যাদি দিতেন; বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতেন; নিরন্নকে অন্ন দিতেন; রোগীকে ঔষধ দিতেন, পথ্য দিতেন। এখানেও সাঁওতালদের শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরমহাশয় একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কর্ম্মা-টারে বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়াও বিশেষ কোনও ফল হইল না। এদিকে বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সম্পূর্ণ বিশ্রামেরও উপায় নাই। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিট্যানে বি-এ ক্লাস খোলা হয়; তাহার পর বি-এল ক্লাসও খোলা হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিট্যান বি-এ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মেট্রোপলিট্যান স্কুলের বড়-বাজারের শাখা ও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের বহুবাজারের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগরমহাশয় অসুস্থ হইয়া কানপুরে গমন করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরমহাশয় সংস্কৃত প্রেসের অবশিষ্ট অংশ রাজকৃষ্ণবাবুকে বিক্রয় করেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় নিজ শরীরের অবস্থা দেখিয়া ক্রমেই গুরু কর্ম্মভার লঘু করিয়া আনিতে-ছিলেন। এই সময়ে তিনি যাঁহাদের কাছে দেনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেনা মিটাইয়া দিতেছিলেন। দেনা মিটাইতে বিদ্যাসাগরের তুলনা ছিল না বলিলেই হয়। তিনি বিস্তর টাকা দেনা করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে এক পয়সা দেনা রাখিয়া যান নাই। এই সময়ে তাঁহার পুস্তকের আয় মাসিক প্রায় ৩।৪ হাজার টাকা ছিল। বিদ্যা-সাগর যাচিয়া ঋণ পরিশোধ করিতেন :

সরকারী ঋণশোধ ও উপাধি

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে গবর্মেণ্ট সি-আই-ই উপাধি প্রদান করেন। তিনি প্রথমতঃ উপাধি-গ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন। পরে অনুরোধে পড়িয়া উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দরবারে গিয়া উপাধির সনন্দ গ্রহণ করেন নাই, বিদ্যাসাগরমহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, তখন পাটীগণিত, ইতিহাস ইত্যাদি ছাপাইয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিবার উদ্দেশে গবর্মেণ্ট তাঁহার হাতে ৫ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। কিন্তু এই টাকা অন্য ব্যাপারে খরচ হইয়া গিয়াছিল। গবর্মেণ্ট এই টাকার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হিসাব-নিকাশেও উহার কোনও উল্লেখ ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগর-মহাশয় স্বয়ং পত্র লিখিয়া গবর্মেণ্টকে এই টাকার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া টাকা পরিশোধ করিয়াছিলেন।

পত্নীবিয়োগ ও জামাতার পদচ্যুতি

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট বিদ্যাসাগরমহাশয়ের পত্নী রক্তামাশয়-রোগে প্রাণত্যাগ করেন। পত্নীর মৃত্যুকালে বিদ্যাসাগরমহাশয়

পত্নীর অনুরোধে পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে ক্ষমা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ইহার পর জামাতা সূর্য্যবাবুকে কোনও কারণবশতঃ মেট্রোপলিট্যানের সেক্রেটারী-পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেন। এই দুই কারণে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। সূর্য্যবাবুর আমোলে মেট্রোপলিট্যান স্কুল ও কলেজের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার উপর মেট্রোপলিট্যানের ভার দিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন।

কলেজের ভার পুনঃগ্রহণ ও পীড়াবৃদ্ধি

আবার তাঁহাকে কলেজের ভার লইতে হইল। জামাতার পদচ্যুতির পর তিনি প্রায় প্রত্যহই স্কুল-কলেজ পরিদর্শন করিতেন। পাল্কী করিয়া যাইতেন—আসিতেন। উত্তরপাড়ায় পড়িয়া যাইবার পর হইতে তিনি প্রায় গাড়ীতে চড়িতেন না। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তিনি স্কুল-কলেজ-পরিচালনের ভার দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। রোগ-জীর্ণ দেহের উপর মেট্রোপলিট্যানের চিন্তায় তিনি কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই শারীরিক ও মানসিক অশান্তির অবস্থাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ গ্রামের বিনষ্ট স্কুলটীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন এবং স্কুলটীর নাম হয়—বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়।

এদিকে ক্রমেই বন্ধুজন-বিয়োগ-ব্যথায় তাঁহার মর্ম্মস্থল নিপীড়িত হইতে লাগিল। বিচারপতি দ্বারকানাথ, প্যারীচরণ সরকার, শ্যামাচরণ বিশ্বাস, কৃষ্ণদাস পাল, দীনবন্ধু মিত্র, মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া লোকান্তর যাত্রা করেন। ইঁহাদের বিয়োগ-বেদনা বিদ্যাসাগরমহাশয় অসহ্য বোধ করিতে লাগিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁহার ছয় বৎসরের উদরাময়রোগ প্রবল হইয়া উঠে।

পাকস্থলীতে অন্ন পরিপাক হইত না। সিদ্ধ করা বার্লি, পালো ইত্যাদি লঘুতম আহার্য্যই তাঁহার অবলম্বন ছিল। চিকিৎসা চলিতে লাগিল; কিন্তু বিশেষ কোনও ফল হইল না। অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি বায়ু পরিবর্ত্তন ও নির্জ্জনবাসের জন্য ফরাসডাঙ্গায় গঙ্গাতীরে এক স্বাস্থ্যকর সুন্দর বাটীতে গমন করেন। এখানে তিনি কলিকাতা অপেক্ষা সুস্থ ছিলেন। ফরাসডাঙ্গায় তিনি চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ছিলেন।

বৈশাখ মাসে আবার পীড়া বৃদ্ধি পায়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে হঠাৎ তাঁহার পাঁজরে বেদনা ধরে এবং তিনি কনিষ্ঠ দৌহিত্র যতীশচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। উদরাময় রোগের জন্য বিদ্যাসাগরমহাশয় আফিম খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আফিম খাইলে দুধ খাইতে হয় কিন্তু দুধ পেটে সহ্য হয় না। সেইজন্য তিনি আফিম ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন। এজন্য কেহ কেহ বিপদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। শেষে কিন্তু আফিম ত্যাগ করাই স্থির হয়। এক হেকিমের নিকট হইতে আফিম ত্যাগের ঔষধ আনাইয়া তিনি খাইয়াছিলেন। সেই ঔষধ খাইবার পর হইতেই তাঁহার পীড়া ক্রমেই বাড়িতে থাকে। ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু দিবা-রাত্র তাঁহার নিকট বসিয়া রোগের গতি নিরীক্ষণ করিতেন। একদিন ভাল, একদিন মন্দ এইরূপ করিতে করিতে শ্রাবণ মাস আসিল। বর্ষা নামিল। পুরাতন গ্রহণীরোগ কায়েমী হইয়া বসিল। বিদ্যা-সাগরমহাশয় শয্যাগ্রহণ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি উঠিতে বসিতে পারিতেন; কিন্তু ৪ঠা শ্রাবণ হইতে আর তাহা পারিলেন না। অবশেষে ১৩ই শ্রাবণ (সন ১২৯৮ সাল) মঙ্গলবার রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটের সময়ে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরমহাশয় ইহলোক হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্মশানযাত্রা ও সৎকার

বিদ্যাসাগরমহাশয় যে খট্টাঙ্গে শয়ন করিতেন সেই খট্টাঙ্গেই তাঁহার শবদেহ শায়িত ও শ্মশানে বাহিত হইয়াছিল। পুত্র, ভ্রাতা, দৌহিত্র, আত্মীয়-স্বজন এবং ভক্তগণ খট্টাঙ্গ স্কন্ধে করিয়া রাত্রি ৪টার সময়ে নিমতলার শ্মশান-অভিমুখে যাত্রা করেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু-সংবাদ সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। অমনই দলে দলে লোক তাঁহার শবদেহ দর্শন করিবার জন্য শ্মশান-অভিমুখে ধাবমান হইল। নিমতলা ঘাট লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট শকটরাজিতে পূর্ণ হইয়াছিল। শ্মশানের রাস্তায় এত ভিড় হইয়াছিল যে, ঠেলাঠেলি করিয়া চলিতে হইয়াছিল।

সূর্য্যোদয়ের পর শবদেহ চিতা-শয্যায় শায়িত হইয়াছিল, পুত্র নারায়ণচন্দ্র মুখাগ্নি করিয়াছিলেন। বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই চিতা নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

চিতা নির্ব্বাপিত হইলে বহু লোক বিদ্যাসাগরমহাশয়ের চিতা-ভস্ম ও অস্থি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

তখন বাঙ্গালায় বিদ্যাসাগরের নাম প্রাতঃস্মরণীয় ছিল। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীর নমস্য ও উপাস্য দেবতাস্বরূপ ছিলেন। তিনি তখন বাঙ্গালার একমাত্র বিরাট পুরুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগর বলিলে তখন বাঙ্গালীমাত্রেরই হৃদয়ে এক মহনীয় ও বরণীয় চিত্র ফুটিয়া উঠিত। সেই বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে প্রত্যেক বাঙ্গালীই অনুভব করিল—যেন বাঙ্গালাদেশ শূন্য হইয়া পড়িল, এ শূন্যতা আর যেন পূর্ণ হইবে না। তাই বাঙ্গালা জুড়িয়া শোকের যে দীর্ঘশ্বাস উঠিল তাঁহার তরঙ্গে সমগ্র দেশ আন্দোলিত হইল। বিদ্যাসাগরের দুঃখে বাঙ্গালার কবি কাঁদিল, গ্রন্থকার কাঁদিল, সংবাদপত্রসেবী কাঁদিল, ব্যবহারাজীব কাঁদিল,

রাজনীতিক কাঁদিল, ধনী কাঁদিল, দুঃখী কাঁদিল, সধবা কাঁদিল, বিধবা কাঁদিল, শিক্ষক কাঁদিল, ছাত্র কাঁদিল, দোকানী কাঁদিল, পশারী কাঁদিল, উত্তমর্ণ কাঁদিল, অধমর্ণ কাঁদিল। বিদ্যাসাগরের জন্য কাঁদে নাই এমন বাঙ্গালী তখন কেহ ছিল না। কারণ, বিদ্যাসাগর যে আপামর-সাধারণ সকলেরই। এমন সার্ব্বজনীন—সর্ব্বপরিচিত পুরুষ বাঙ্গালায় কদাচিৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কবি মানকুমারী শ্মশানে দাঁড়াইয়া বিদ্যাসাগরমহাশয়ের সৎকার সন্দর্শন করিয়া জ্বালাময়ী ভাষায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার স্বরূপ অনেকটা প্রকটিত হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—"অই জাহ্নবী-বক্ষে ধূ ধূ করিয়া চিতার আগুন জ্বলিতেছে! ঐ আগুনে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইতেছে! বাঙ্গালার পিরামিড ভস্মসাৎ হইতেছে। ঐ ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে! ঐ আগুনে বাঙ্গালার সম্মান-গৌরব পুড়িয়া ছাই হইতেছে। ঐ জ্বলন্ত আগুনে বাঙ্গালীর প্রধান গর্ব্ব—প্রধান অহঙ্কার পুড়িয়া যাইতেছে। ঐ চিতার আগুনে আজ কত কি ফুরাইল! কত কাঙ্গাল-গরীব মাতা পিতা হারাইল। কত হৃদয় আজি আশা-ভরসা-হারা হইল। শ্রাবণের মেঘ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইতেছে! ঐ চিহ্ন ফুরাইয়া আসিতেছে।"

বিদ্যাসাগরমহাশয়ের মৃত্যুতে সত্য সত্যই বাঙ্গালা দেশে শোকের ঝড় বহিয়াছিল। এমন সহর নগর গ্রাম পল্লী ছিল না যেখানে তাঁহার জন্য শোক-সভার অধিবেশন হয় নাই। সর্ব্বত্র শোক—সকল সংবাদ-পত্রে সেই শোকের তীব্র অভিব্যঞ্জনা। শত্রু-মিত্র সকলের মুখেই শোক।

বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তি

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান কীর্ত্তি—মেট্রোপলিট্যান কলেজ ও বিদ্যালয়।

বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়।

হিন্দু এনিউইটী ফণ্ড।

পুস্তকাগার।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ও প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তক

(১) বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ

(২) কথামালা (৩) বোধোদয় ও (৪) চরিতাবলী (৫) আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগ (৬) বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ (৭) জীবনচরিত (৮) বেতাল পঞ্চবিংশতি (৯) শকুন্তলা (১০) সীতার বনবাস (১১) ভ্রান্তিবিলাস (১২) মহাভারত (১৩) সংস্কৃতভাষা প্রস্তাব (১৪) বিধবা-বিবাহ বিচার (১৫) বহুবিবাহ বিচার।

সংস্কৃত পুস্তক

(১) উপক্রমণিকা (২) ব্যাকরণ কৌমুদী (৩) ঋজুপাঠ (৪) মেঘদূত (৫) শকুন্তলা (৬) উত্তরচরিত

ইংরেজী পুস্তক

(১) Poetical Selections (২) Selections from Goldsmith.

যে সকল পুস্তকের স্বত্বাধিকার ক্রীত হইয়াছে

(১) মদনমোহন তর্কালঙ্কার-প্রণীত শিশুশিক্ষা তিন ভাগ।

(২) রামনারায়ণ তর্করত্ন-প্রণীত কুলীনকুলসর্ব্বস্ব।

প্রকাশিত পুস্তক

কাদম্বরী, সটীক বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতি মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক।

কবি হেমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর

কবি হেমচন্দ্র কয়েক ছত্র কবিতায় বিদ্যাসাগরমহাশয়ের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহাই বিদ্যাসাগর-চরিত্রের প্রকৃত আলেখ্য। সে কয় ছত্র এই :—

"আসচে দেখ সবার আগে বুদ্ধি সুগভীর,
বিদ্যার সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির।
বঙ্গের সাহিত্যগুরু শিষ্ট সদালাপী,
দীক্ষা-পথে বুদ্ধঠাকুর, স্নেহে জ্ঞানবাপী।
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি,
কাঙ্গাল-বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি।
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্র্যে সেঁকুল কাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরেজীর ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত "ডিস’.
টোল-স্কুলের অধ্যাপক দুয়েরই ফিনিস।"

কবি রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগর

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিদ্যাসাগর-সম্বন্ধে তদ্‌রচিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—"তাঁহার (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের) প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভ.ষা কখনও সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাতৃগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়, যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোক-দুঃখের মধ্যে এক নূতন

সান্ত্বনাস্থল—সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন সৃজন করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্ত্তি তাহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে। * * * বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা গদ্যে কলা-নৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা ঝুলিমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পূরিয়া দিলেই যে কর্ত্তব্য সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কার্য্যটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজ-বন্ধন যেমন মনুষ্যের বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে;—জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত, প্রতিহত করিয়া থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছিলেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাব-প্রকাশের কঠিন বাধাসকল অতিক্রম করিয়া সাফল্যলাভে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু যিনি সেই সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।”

স্বর্গীয় রজনীকান্ত গুপ্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—
“বিদ্যাসাগর ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। পৃথিবীতে যেসকল মহাপুরুষ মহৎ-

কার্য্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর তাঁহাদের অপেক্ষা মহত্তর, যে হেতু তিনি প্রতিভার সহিত অসামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তেজস্বী মহাপুরুষ অপেক্ষা মহত্তর, যে হেতু তিনি তেজস্বিতার সহিত স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি দানশীল ব্যক্তিগণ অপেক্ষা মহত্তর, যে হেতু তিনি দানশীলতা প্রকাশের সহিত বিষয়-বাসনা ও আত্মগৌরব ঘোষণার ইচ্ছা সংযত রাখিয়াছেন।"

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার একস্থলে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"এই হতভাগ্য দেশে হতভাগ্য জাতির মধ্যে সহসা বিদ্যাসাগরের মত একটা কঠোর কঙ্কালবিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপে উৎপত্তি হইল, তাহা জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার পক্ষে একটা বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। সেই দুর্দ্দম প্রকৃতি, যাহা ভাঙ্গিতে পারিত, কখন কেহ কেহ নোয়াইতে পারে নাই; সেই উগ্র পুরুষকার, যাহা সহস্র বিঘ্ন-বিপত্তি ঠেলিয়া ফেলিয়া আপনাকে অব্যাহত করিয়াছে; সেই উন্নত মস্তক যাহা কখন ক্ষমতার নিকট ও ঐশ্বর্য্যের নিকট অবনত হয় নাই; সেই উৎকট বেগবতী ইচ্ছা, যাহা সর্ব্ববিধ মিথ্যাচার ও কপটাচার হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ও স্বাধীন রাখিয়াছিল, তাহার বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর মধ্যে আবির্ভাব একটা অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে গণ্য হইত, সন্দেহ নাই।"

* * * * * * *

"বিদ্যাসাগরের লোকহিতৈষিতা সম্পূর্ণ প্রাচ্য ব্যাপার। ইহা কোনরূপ নীতিশাস্ত্রের, ধর্ম্মশাস্ত্রের, অর্থশাস্ত্রের বা সমাজশাস্ত্রের অপেক্ষা করিত না। এমন কি, তিনি হিতৈষণাবশে যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই আধুনিক সমাজতত্ত্ব মঞ্জুর করিবে না। কোন স্থানে দুঃখ দেখিলেই যেমন করিয়াই হউক তাহার প্রতীকার করিতে

হইবে, একালের সমাজতত্ত্ব তাহা স্বীকার করিতে চাহে না। কিন্তু দুঃখের অস্তিত্ব দেখিলেই বিদ্যাসাগর তাহার কারণানুসন্ধানের অবসর পাইতেন না। লোকটা অভাবে পড়িয়াছে জানিবামাত্রই বিদ্যাসাগর সেই অভাব মোচন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।"

বাঙ্গালায় বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন,—"ভাগীরথী গঙ্গার পুণ্য-ধারায় যে ভূমি যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া সুজলা শস্যশ্যামলা হইয়া রহিয়াছে, রামায়ণী গঙ্গার পুণ্যতর অমৃত-প্রবাহ সহস্র বৎসর ধরিয়া যে জাতিকে সংসারতাপ হইতে শীতল রাখিয়াছে, সেই ভূমির মধ্যে ও সেই জাতির মধ্যেই বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সঙ্গত ও স্বাভাবিক।"

বিদ্যাসাগরের দেশাত্মবোধ (Patriotism)

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিদ্যাসাগরের দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"যিনি স্বদেশের স্বাধীনতা, গৌরব, তেজোবীর্য্য এবং মহত্ত্ব রক্ষা করিয়া মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করেন, তিনিই patriot। তিনি যদি নেপোলিয়ানের ন্যায় রুধির-স্রোতে দেশকে ভাসাইয়া দিয়া দেশের অহিত সাধন করেন আর বলেন যে, দেশের মহত্ত্ব যদি না রহিল তবে তাহার হিতে কাজ নাই, তথাপি তিনি Patriot। পক্ষান্তরে যাঁহারা কাটা ছাঁটা আঁটা সাঁটা পোষাক এবং দোকান-সাজানিয়া গৃহ-সজ্জাতেই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখেন; স্বদেশের কিছুই দুচক্ষে দেখিতে পারেন না; এমন কি, স্বদেশের সর্ব্ববাদিসম্মত বিশিষ্ট উৎকর্ষ স্থানটিকেও যাঁহারা কেবল অন্যের দেখাদেখি নাক-মুখ সিট্‌কাইয়া ভালবাসেন বলেন—তা বই কি, তাহার ভালত্ব আপন চক্ষে দেখেনও না—দেখিতে জানেনও না; যাঁহারা স্বদেশের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন না, স্বদেশের অপমানেও আপনাদিগকে

অপমানিত মনে করেন না, তাহা দূরে থাকুক উল্টা আরো যাঁহারা স্বদেশকে নীচু করিয়া আপনারা উঁচু হইবার চেষ্টায় 'যাচিয়া মান' এবং 'কাঁদিয়া সোহাগে'র কর্দ্দমাক্ত পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হন, তাঁহারা যদি দেশের 'মাথা হেঁট করা' দেহের যাঁতা চালাইবার উপযোগী মহামহা বহ্বাড়ম্বরের ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া দেশহিতৈষিতার ধ্বজা উড়াইতে এক মুহূর্ত্তও ক্ষান্ত না হন, তাহা হইলেও আমি তাঁহাদিগকে Garibaldi বলিব না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ওরূপ Garibaldi ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে আমরা patriot বলিতেছি। তিনি যদি একশত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতেন, শত সহস্র দরিদ্র লোককে আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, দশ কোটি বিধবার মৃত সাধব্য পুনর্জীবিত করিতেন, তাহা হইলে বলিতাম, তিনি মস্ত একজন philanthropist। Patriot তাঁহাকে বলিতেছি অনেক কারণে, যখন তিনি Woodrow সাহেবের অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া নিঃসম্বল হস্তে গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক লেখনী যন্ত্র দ্বারা জীবিকা-সংস্থানের পথ কাটিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বলিলাম যে, হাঁ ইনি Patriot, যেহেতু ইনি খাওয়া পরা অপেক্ষা স্বাধীনতাকে প্রিয় বলিয়া জানেন। যখন দেখিলাম যে, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার কৃত্রিম কুহকাংশে পদাঘাত করিয়া স্বদেশীয় উচ্চ অঙ্গের সভ্যতা বিদ্যা বিনয় দয়া দাক্ষিণ্য মহত্ত্ব এবং সদাশয়তা—সমস্তই আপনাতে মূর্ত্তিমান্ করিয়াছেন, তখন বুঝিলাম যে, এ ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ সত্য সত্যই Patriot ছাঁচে গঠিত। যখন দেখিলাম যে, 'এদেশের কিছু হইবে না' বলিয়া তিনি অকেজো মৌখিক সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সংসর্গে বিমুখ হইয়া বাষ্পগদ্গদলোচনে গৃহকোটরে ঢুকিয়া আপনাতে আপনি ভর করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন—দীপ্ত দিবাকর অল্পে অল্পে তেজোরশ্মি গুটাইয়া অস্তাচলশিখরে অবনত হইতেছেন, তখন বুঝিলাম যে,

পূর্ব্বজন্মে ইনি প্রাচীন রোম নগরের কোন একজন খ্যাতনামা Patriot ছিলেন—পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গ হইতে আমাদের এই হতভাগ্য দেশে নিপতিত হইয়া মনের খেদে ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইতেছেন ; অথচ কেহ তাঁহাকে পুঁছিতেছে না।”



স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

বংশ-বিবরণ

আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম শ্রীহর্ষ-বংশোদ্ভব কামদেব পণ্ডিতের একাদশ সন্তান। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম মধুসূদন। মধুসূদনের পুত্র সন্তোষ। সন্তোষের পুত্র রমাকান্ত। রমাকান্ত পৈতৃক বাসস্থান যশোহরের অন্তঃপাতী কুশদহ অঞ্চল ত্যাগ করিয়া হুগলী জেলার দশঘরা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রমাকান্তের পুত্র গোপীবল্লভ। গোপীবল্লভের পুত্র রাম-কানাই মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বদনগঞ্জ গ্রামে কুলভঙ্গ করেন। রামকানাইয়ের পুত্র রামেশ্বর বিদ্যাবাগীশ খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী নতিবপুর গ্রামে বসবাস করেন। রামেশ্বরের পুত্র হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম। ইনি ভূদেবের পিতামহ।

সার্ব্বভৌম মহাশয়েরা পাঁচ ভ্রাতা; ইনি সর্ব্ব কনিষ্ঠ। পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া পাঁচ ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে সার্ব্বভৌম মহাশয় জ্যেষ্ঠগণকে বলেন,—আপনারা গুরুজন; পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া আপনাদের সহিত বিবাদ করিতে পারিব না, তাহা অপেক্ষা এই সম্পত্তির স্বত্ব ত্যাগ করিলাম। ইহার পর তিনি নতিবপুর হইতে মেদিনীপুরে চলিয়া আসেন। সেখানে কলিকাতা-নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি তখন মেদিনীপুরের কলেক্টরীতে কর্ম্ম করিতেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সরলতা ও সাধুতাব্যঞ্জক আকৃতি দেখিয়া রায়মহাশয় তাঁহাকে নিজ বাসায় লইয়া আসেন ও ক্রমে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। কিছুদিন পরে

কৃষ্ণচন্দ্র রায় পেন্সন লইয়া কলিকাতায় আসেন। সার্ব্বভৌম মহাশয়ও তাঁহার অনুগামী হন। তিনি হরিতকী বাগানে সামান্যরূপ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া অধ্যাপনা ও পৌরোহিত্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করেন।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের আটটি পুত্রসন্তান; তন্মধ্যে ভূদেবচন্দ্রের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণই জ্যেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা পণ্ডিত। আটটি পুত্রের মধ্যে তিনটী অবিবাহিত এবং দুইটি বিবাহিত অবস্থায় পিতৃ-বর্ত্তমানেই পরলোক গমন করেন। অবশিষ্ট তিন পুত্রের মধ্যে বিশ্বনাথই উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন।

সার্ব্বভৌম মহাশয় ৯৩ বৎসর বয়সে স্বর্গলাভ করেন। মৃত্যুকালে তিনি জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর দুইটি বিধবা পুত্রবধূ, দুইটী অক্ষম পুত্র এবং চারি শত টাকা ঋণ ফেলিয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ে ভূদেব বার বৎসরের বালক।

ভূদেব-জনক বিশ্বনাথ

ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ সন ১১৯৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুন্দর ও সুশ্রী ছিলেন। তাঁহার আকৃতি দীর্ঘ, কান্তি গৌর, ললাট প্রশস্ত এবং নেত্রদ্বয় বিশাল ছিল। তিনি বাল্যকালে পিতৃগৃহে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া খানাকুল কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ৺ভবানীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট উহার অবশিষ্ট অংশ অধ্যয়ন করেন। কৃষ্ণনগরে অধ্যয়নকালেই পিতা সার্ব্বভৌম মহাশয় গৃহত্যাগ করিলে তাঁহাকেও কৃষ্ণনগরের চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে হয়। তৎপরে তিনি গঙ্গাগ্রামে ৺রামচরণ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্রের আচারকাণ্ড ও ৺নকুড়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট সিদ্ধান্ত জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন

করেন এবং উভয় শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। কলিকাতায় তিনি রঘুমণি বিদ্যাভূষণের নিকট স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবহারকাণ্ড অধ্যয়ন করেন।

১২২৬ সালে তর্কভূষণ মহাশয়ের বিবাহ হয়। বিবাহ হইয়াছিল নতিবপুর অঞ্চলে পাণ্ডুগ্রামের পালধি-বংশীয়া ব্রহ্মময়ী নাম্নী এক কন্যার সহিত।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তর্কভূষণ মহাশয়কে বসিয়া থাকিতে হয় নাই। ৺তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, ৺চন্দ্রশেখর দেব ও ৺দক্ষিণারঞ্জন—এই তিনজন তাঁহার নিকট সংস্কৃত কাব্য পাঠ করেন। এই তিনজন ছাত্র ইংরেজীতে কৃতবিদ্য ছিলেন। ইঁহাদের সহিত পরিচিত হইয়া বিশ্বনাথকে ইঁহাদের সহিত ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত সভা-সমিতিতে যাইতেও হইত। ক্রমে তর্কভূষণ এই সভার পণ্ডিত নিযুক্ত হন। কিন্তু সভার সদস্যগণ তাঁহাকে দেশাচার এবং দেশধর্ম্মের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে বলিলে তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই, সভার পণ্ডিতী ত্যাগ করেন।

অতঃপর তিনি দুই বৎসর কাল ভারতের নানাতীর্থে ভ্রমণ করেন। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে তাঁহার পূর্ব্বতন ছাত্রেরা তাঁহাকে পরম সম্মানসহ গ্রহণ করিলেন। ৺তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মনুসংহিতার অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তিনি তর্কভূষণ মহাশয়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; তর্কভূষণমহাশয় তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। মনুসংহিতার অনুবাদ কিছুদূর অগ্রসর হইলে তর্কভূষণ মহাশয়ের ছাত্রদ্বয়—তারাচাঁদ এবং চন্দ্রশেখর সমান মূলধনে একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং তর্কভূষণ মহাশয়কে উহার অংশী করিয়া লন। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রটী স্থাপিত হইবার কয়েক মাস পরেই তারাচাঁদ মুন্সেফ ও চন্দ্রশেখর ডেপুটি হইয়া চলিয়া যান। তর্কভূষণ মহাশয়েরই উপর তখন ছাপাখানাটীর পরিচালন-ভার ন্যস্ত হয়। তিনি এই

ছাপাখানা হইতে বার্ষিক পঞ্জিকা, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার টীকা, শান্তি-শতকের টীকা, বালবোধিনী এবং বহু বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্য প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

তর্কভূষণমহাশয় 'ল কমিটি'র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বাঁকুড়া জেলার জজপণ্ডিতের পদ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে এই পদ উঠিয়া যাওয়ায় আর তিনি জজপণ্ডিতী করেন নাই; ছাপাখানার কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয়ের বাহ্য আকৃতি যেরূপ সুন্দর ছিল, চিত্তও সেইরূপ বিশুদ্ধ ও পবিত্র ছিল। তিনি শুদ্ধাচার, সংযতমনাঃ, সত্যসন্ধ. তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। সন ১২৭২ সালের ভাদ্রমাসে চুঁচুড়ার বাটীতে একমাত্র পুত্র, এক কন্যা ও পৌত্র-দৌহিত্রাদি রাখিয়া এই ঋষিকল্প পুরুষ ইহধাম ত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

ভূদেবের জন্ম, শৈশব ও শিক্ষা

সন ১২৩১ সালের ৩রা ফাল্গুন (১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারী) রবিবার কলিকাতা ৩৭নং হরিতকী বাগান লেনে ভূদেব মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের বয়স ৩১ বৎসর।

শৈশবে ভূদেববাবুর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। প্রায়ই জ্বর ও পেটের অসুখ হইত। এইজন্য কবিরাজা ঔষধ তাঁহাকে বিস্তর খাইতে হইয়াছিল। শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিবেন বলিয়া তাঁহার পিতামাতা নতিবপুরের নিকটবর্ত্তী জোতরাম গ্রামের ক্ষেত্রপাল নামক গ্রাম্যদেবতার নামে ভূদেববাবুর মাথায় চুল রাখিয়াছিলেন। এই চুল খুব লম্বা হইয়া জট বাঁধিয়াছিল। শেষে তাঁহার শরীর অনেকটা নীরোগ হইয়াছিল। তখন দেবতার নিকট গিয়া মাথার চুল কামাইয়া ফেলা হয়।

তর্কভূষণমহাশয়ের পরিবারে দেবতা-ব্রাহ্মণের প্রতি অচলা ভক্তি ও নিষ্ঠা ছিল। ভূদেব-জননীর ভক্তির মাত্রা অসাধারণ ছিল। স্বামীর প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভক্তি ছিল। তিনি প্রত্যহ স্বামীর পাদোদক পান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না।

ভূদেব যখন তিন চারি বৎসরের শিশু, সেই সময়ে তিনি একবার খেলিতে খেলিতে শিশুসুলভ কৌতূহলবশতঃ তাঁহার পিতার চর্ম্ম-পাদুকা পায়ে দিয়াছিলেন। ইহাতে ভূদেব-জননী শিশুর এই অজ্ঞানকৃত অপরাধে বিচলিত হইয়া অধর্ম্মের আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং পারিবারিক অকল্যাণের সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে ঐ জুতা শিশু ভূদেবকে দিয়া মাথায় বহাইয়া ও নিজে পুনঃ পুনঃ উহাকে প্রণাম করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

হাতে খড়ি হইবার পূর্ব্বেই ভূদেববাবু তাঁহার পিতার নিকট হইতে মুখে মুখে অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক শিখিয়াছিলেন। ঐসকল শ্লোক তিনি প্রত্যহ প্রাতে পিতৃসমীপে আবৃত্তি করিতেন। পিতা পুত্র একসঙ্গে ভাঁটা খেলিতেন, তীর ছুঁড়িতেন, প্রাতে ও সন্ধ্যায় একত্র দৌড়াদৌড়ি করিতেন। পিতা পুত্রকে বাগানে লইয়া গিয়া ভিন্ন ভিন্ন গাছ ও পাতা ফুল দেখাইয়া তাহাদের নাম বলিয়া দিতেন।

পঞ্চমবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে ভূদেববাবুর অক্ষরপরিচয় হয় নাই। পিতামহ সার্ব্বভৌম মহাশয় ভূদেববাবুর হাতে খড়ি দেন। বাড়ীতে কিছু বাঙ্গালা পড়িয়া ও সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়া নবম বৎসর বয়সে ভূদেববাবু সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন এবং সেখানে প্রায় দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া ভূদেববাবু মন দিয়া পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে উলাষ্টন নামক এক ইংরেজ ও দুইজন বাঙ্গালী সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষা দিতেন। উলাষ্টন সাহেব একদিন ভূদেবের আকৃতি প্রকৃতিতে আকৃষ্ট হইয়া

তাঁহাকে নিকটে ডাকিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি ইংরেজী পড়িবে?' সাহেবের শিষ্টাচারে ভূদেববাবু ইংরেজী পড়িতে সম্মত হইলেন। এক বৎসর তিনি অভিভাবকদিগকে লুকাইয়া উলাষ্টন সাহেবের নিকটে ইংরেজী পড়িয়াছিলেন এবং এই সময়ে তাঁহার ৩নং ইনষ্ট্রাক্‌টর পুস্তক পড়া হইয়া গিয়াছিল।

উলাষ্টন সাহেব যেরূপ যত্ন করিয়া ছাত্রদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিতেন, অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সংস্কৃত শিক্ষায় সেরূপ যত্ন লইতেন না। কাজেই ভূদেববাবুর ব্যাকরণ-শিক্ষা আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। এই সময়ে তাঁহার পিতার অনুপস্থিতিতে সংস্কৃতেরও অনুশীলন হয় নাই। ভূদেববাবু ইংরেজী শিক্ষার দিকেই ঝোঁক দিয়াছিলেন। সুতরাং তর্কভূষণ মহাশয় তীর্থ-প্রত্যাগত হইয়া পুত্রের সংস্কৃত শিক্ষায় অমনোযোগিতা দেখিয়া দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। পরে সকলের পরামর্শে এবং ভূদেবের আগ্রহাতিশয্যে স্থির হইল যে, ভূদেবকে ইংরেজী স্কুলেই ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইবে। তর্কভূষণ মহাশয় স্বয়ং পুত্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া রাজা রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান একাডেমি' স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। রাজা রামমোহন বিলাতে যাইলে পূর্ণবাবুর উপর উহার ভার অর্পণ করিয়া যান। ভূদেববাবু যখন ভর্ত্তি হইলেন তখনও স্কুলের পরিচালন-ভার পূর্ণবাবুর উপর ন্যস্ত ছিল। এই স্কুলের যে শ্রেণীতে সেকেণ্ড নম্বর রীডার পড়া হইত তিনি সেই শ্রেণীতে পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে মিসেস উইলসন নাম্নী এক মিশনারী মহিলা হেদুয়ার নিকট থাকিতেন। উলাষ্টন সাহেবের অনুরোধে তিনি ভূদেবকে ইংরেজী পড়াইয়াছিলেন। বিবি উইলসন ও উলাষ্টন সাহেবের মত উৎকৃষ্ট শিক্ষকের নিকট ইংরেজীর প্রাথমিক শিক্ষা হইয়াছিল বলিয়া ভূদেববাবু উত্তরকালে ইংরেজীতে বিশেষরূপ কৃতবিদ্য

হইতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি আরও একবার স্কুল পরিবর্ত্তন করেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে ভূদেববাবুর উপনয়ন হয়। তাহার পর চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু-কলেজের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েন।

মাইকেল মধুসূদনের সহিত পরিচয়

হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইবার কয়েক দিন পর হইতেই ভূদেবের সহিত মাইকেল মধুস্থদন দত্তের আলাপ হয়। ক্রমে এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ভূদেববাবু মধুস্থদন সম্বন্ধে নিজেই লিখিয়াছেন :—"মধুস্থদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িবার পরে আমি যখন হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর তখন যৌবনের প্রাক্কাল, কৈশোর অবস্থা অতিক্রান্তপ্রায় হইয়াছে।

"রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদিগকে পড়াইতেন। আমি যেদিন প্রথম ভর্ত্তি হইলাম, সেই দিন রামচন্দ্রবাবু পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজীওয়ালা মাত্রেই, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষকেরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে বড়ই ভালবাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্রবাবু তাহা জানিতেন, এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল। কিন্তু ভূদেব তোমার বাবা এ কথা স্বীকার করিবেন না।" আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটীর পর বাড়ী আসিলাম। কাপড়-চোপড় ছাড়িতে দেরী সহিল না, একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা

করিলাম,—"বাবা, পৃথিবীর আকার কি রকম ?" তিনি বলিলেন, "কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।" এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুঁথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, ঐ গোলাধ্যায় পুঁথিখানির অমুক স্থানটী দেখ দেখি।" আমি সেই স্থানটি বাহির করিয়া দেখিলাম তথায় লেখা রহিয়াছে— "করতল কলিতামলক বদমলং বিদন্তি য গোলং।" বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটি টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্রবাবুকে বলিলাম, "আপনি বলিয়াছিলেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা ত পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন, এই দেখুন তিনি বরং এই শ্লোকটি আমাকে পুঁথির মধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।" রামচন্দ্রবাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া বলিলেন, "কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল; তা তোমার বাবা বল্‌বেন বৈ কি, তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।"

"রামচন্দ্রবাবুতে ও আমাতে যখন এই সকল কথা হয়, তখন ক্লাসের একটি ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষরূপ আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম। বর্ণ কাল হইলেও ছেলেটী দেখিতে বেশ সুশ্রী, শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটি বড় বড় ও অতিশয় উজ্জ্বল, দেখিলে অতিশয় বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়শীল বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ স্কুলে ছিলাম ততক্ষণই মধ্যে মধ্যে অতি তীব্র দৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিতেছিল। ছুটীর পর একেবারে আমার নিকটে আসিয়া সেক্‌হাণ্ড করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ভাই তোমার নাম কি, কোথায় ঘর তোমার? ইত্যাদি।" আমি তাহার এই অতিমিষ্ট সম্ভাষণ ও সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া একে একে তৎকৃত সকল প্রশ্নগুলিরই উত্তর দিলাম।

"ইনিই মধু। এই দিন হইতেই ইঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই উভয়ে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল।

মধু মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমাদের বাটীতে আসিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সমপাঠীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আমাদের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। আমার মা সকলকেই অতিশয় যত্ন করিতেন, আমাদের সকলকেই খাবার খাইতে দিতেন, গায়ে মাথায় ধুলা লাগিলে চুল আঁচড়াইয়া ও গা ঝাড়িয়া দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেন। সেই হইতেই আমার মায়ের উপর মধুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। মধু আমাদিগের বাড়িতে আসিত, কিন্তু আমি কোন দিন মধুর বাড়ীতে যাই নাই; মধু আমায় তজ্জন্য অনুরোধও করে নাই। বোধ হয় আমাদের বাড়ীর ধরণ ও মধুর বাবার বাসাবাড়ীর ধরণ স্বতন্ত্র ছিল; সুতরাং তথায় লইয়া গেলে পাছে আমার প্রীতি না হয়, এইজন্যই সম্ভবতঃ মধু আমাকে ওরূপ অনুরোধ কোন দিন করে নাই। ক্লাশে মধু ও আমি একসঙ্গে বসিতাম। মধু যে পুস্তকখানি পড়িত সেখানি আমাকে না পড়াইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। ফল কথা উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।"

ছাত্রজীবনে ধর্ম্ম ও আচারনিষ্ঠা

এই সময়ে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মনে ইংরেজী আচার-ব্যবহার ও আদব-কায়দার অনুকরণ-প্রবৃত্তি ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। স্বদেশীয় রীতিনীতি ও আচারধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছিল। অনুকরণের স্রোত এতই তীব্র হইয়া উঠিতেছিল যে, তাহার বেগে অনেককেই বিভ্রান্ত হইতে হইয়াছিল। এই সন্ধিক্ষণে—এই তীব্র স্রোতের মধ্যে ভূদেব স্বজাতীয় আচারধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন; বিজাতীয় অনুকরণ-প্রবৃত্তি তাঁহার চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে ভূদেববাবুর সহাধ্যায়ী ও সুহৃদ স্বর্গীয় রাজ-

নারায়ণবাবু লিখিয়াছেন :—"তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন মদ্যপান সভ্যতার চিহ্ন; উহাতে দোষ নাই। আমি এবং আমার কতকগুলি সহচর একত্র হইয়া গোলদীঘিতে বসিয়া মদ খাইতাম। এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে সেখানে কতকগুলি সিককাবারের দোকান ছিল। আমরা গোলদীঘির রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) ঐ কাবাব কিনিয়া আনিয়া আহার করিতাম। আমি ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলস্পর্শশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া সভ্যতা ও সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শক কার্য্য বলিয়া মনে করিতাম।

"এইরূপ বিশ্বাসে এবং ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলে ভূদেববাবুর সহাধ্যায়ী-দিগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অমিতাচারের ফলে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অনেকে না হিন্দু, না মুসলমান-না খৃষ্টিয়ানভাবে চিরজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সে তরঙ্গে স্বল্পাধিক পরিমাণে বিচলিত হন নাই, ভূদেববাবুর সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে সেরূপ অতি অল্পই ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার ন্যায় আর দুই এক জনই কেবল সাগরমধ্যস্থিত পর্ব্বতের ন্যায় সেই প্লাবনের মধ্যে অটলভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন।"

স্বর্গীয় গৌরদাস বসাক ভূদেববাবুর সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি হিন্দু কলেজে ভূদেববাবুর ছাত্রজীবনের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"কলেজে প্রত্যহ টিফিনের ছুটী হইত। ছুটীর সময় কেহ খেলা করিত, কেহ পাঁচ জনের সহিত একত্র বসিয়া গল্পগুজব করিত, কোথাও বা দুই পাঁচ জন একত্র সম্মিলিত হইয়া কুপরামর্শ আঁটিত। ভূদেব টিফিনের ছুটীর সময় ক্লাস হইতে বাহির হইত না। সে বড়ই গম্ভীর এবং অল্পভাষী ছিল, কেবল বই লইয়া বসিয়া থাকিত। সে নয় হাতি

মোটা দেশী লালপেড়ে ধুতি, মলমলের চাদর এবং পায়ে চটিজুতা ব্যবহার করিত। কাহার সঙ্গে বেশী কথা কহিত না এবং তাহার সহিত কেহ বড় একটা কথা কহিত না। তাহাকে সকলেই "পুস্তক-কীট" বলিয়া জানিত। কোন রূপ বৃথা গল্প তাহার ভাল লাগিত না। ক্লাসের মধ্যে সেই সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণধী এবং সচ্চরিত্র ও সুনীত ছাত্র ছিল।

"ক্লাসের ছেলেরা যখন বিস্কুট প্রভৃতি ইংরাজী খাদ্য খাইত, ভূদেব তখন তাহাদের সঙ্গে থাকিত না। এমন কি কলেজে ব্রাহ্মণ শূদ্রের জন্য পৃথক্ জলপাত্রের ব্যবস্থা থাকিলেও সে কখন তথায় একঘটি জল খাইয়াছে কি না সন্দেহ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময় আমার বিবাহ হয়। সেই বিবাহ উপলক্ষে আমি বাগান-বাড়ীতে সহপাঠী-দিগকে একটী ভোজ দিই; ভূদেব সে ভোজে যোগ দেয় নাই। কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া কর্ম্মসূত্রে আমি যখন খুলনা, সিউড়ি প্রভৃতি স্থানে থাকিতাম, তখন ভূদেব আমার ওখানে যাইয়া খাইয়াছেন সত্য, কিন্তু নিজের ব্রাহ্মণ দিয়া রাঁধাইয়া তবে খাইয়াছেন। তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠা সকল দিকেই ছিল।

"এক কথায় বলিলে গেলে, হিন্দু কলেজে পঠদ্দশায় আমাদের সহপাঠিগণ ও অপরাপর ছাত্রগণের মধ্যে ভূদেব একজন অতি কঠোর ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু, অতুলনীয় পবিত্রচরিত্র এবং অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ছিল। তাঁহাকে কখনও অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত দেখা যায় নাই। তাঁহার আদর্শে গঠিত চরিত্র সমস্ত ক্লাসের মধ্যে আর কাহারও ছিল না। তাঁহার বাল্যের এইসমস্ত গুণ উত্তরকালে কার্য্যে বিকশিত হইয়াছিল।"

ভূদেববাবুর পুস্তক কিনিবার সঙ্গতি ছিল না। তাঁহার পিতা কোনও প্রকারে তাঁহার স্কুলের মাহিয়ানাটিই জোগাইতেন; পুস্তক

কিনিয়া দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সেইজন্য তাঁহাকে পরের নিকট হইতে পুস্তক চাহিয়া আনিয়া পড়িতে হইত। একবার দক্ষিণার পয়সা জমাইয়া তিনি একখানি ইংরেজী অভিধান ক্রয় করিয়াছিলেন। ভূগোল অনুশীলনের জন্য মানচিত্র দেখা আবশ্যক; সেই মানচিত্র দেখিবার জন্য তাঁহাকে হরিতকী বাগান হইতে বাগবাজারে যাইতে হইত। পরের পুস্তক কাছে বহুদিন রাখা যাইত না বলিয়া তিনি পুস্তক আনিয়া উহা হইতে প্রয়োজনীয় অংশগুলি টুকিয়া লইতেন। এইরূপ করায় তাঁহার স্মৃতিশক্তি বলবতী হইয়া উঠিতেছিল।

ক্লাস প্রোমোশন ও বিবাহ

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ভূদেববাবু অষ্টম শ্রেণী হইতে 'ডবল প্রোমোশন' পাইয়া ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে জোন্স সাহেবের ক্লাসে এবং পর বৎসর ৫ম শ্রেণীতে হ্যালফোর্ড সাহেবের শ্রেণীতে উঠিলেন। পঞ্চম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিবার সময়েই কলিকাতা বেটু চাটুজ্যের ষ্ট্রীটের ৺পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত ভূদেববাবুর বিবাহ হয়।

ভূদেববাবু যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়েন সেই সময়ে একবার তাঁহার স্কুলের ১৬ মাসের ৮০৲ টাকা মাহিনা বাকী পড়িয়াছিল। পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তাঁহার মাসিক আয় সামান্যই ছিল। সুতরাং এত টাকা ঋণ শোধ করিয়া যে পুত্রকে হিন্দু স্কুলে আবার পড়াইতে পারিবেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, ঐ বৎসর ভূদেববাবু পঞ্চম শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করেন ও বৃত্তির টাকা হইতেই স্কুলের বেতন পরিশোধ হয়। ভূদেববাবু জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রথম হইয়াছিলেন,—তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র জগদীশনাথ রায় (ইনি পরে ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন)। হিন্দু কলেজে তখন দুইটী বিভাগ ছিল—একটী সিনিয়র বিভাগ, অপরটী জুনিয়র বিভাগ। প্রথম শ্রেণী হইতে

পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত সিনিয়র বিভাগ এবং ষষ্ঠ হইতে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী পর্য্যন্ত জুনিয়র বিভাগ। কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রেরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিতেন। সিনিয়র ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইলেই পঞ্চম শ্রেণী হইতে ভূদেববাবু, মাইকেল মধুসূদন, গৌরদাস বসাক, শ্যামাচরণ লাহা ও বঙ্কুবিহারী দত্ত জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। অতঃপর ভূদেববাবু ও তাঁহার এই চারিজন সহপাঠী পঞ্চম শ্রেণী হইতে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন।

ভূদেববাবুর বিবাহের এক বৎসর পরে ভূদেববাবু সস্ত্রীক তাঁহার মাতার নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন। দীক্ষালাভ করিয়া ভূদেববাবু যথারীতি জপাদি করিতেন। প্রত্যহ স্নানের পর তিনি মাতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন ও পরে আহার করিয়া স্কুলে যাইতেন।

ভূদেববাবুর বয়স যখন ১৬ বৎসর সেই সময়ে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। কিন্তু স্নেহময় পিতা তাঁহাকে মাতৃশোক-অনুভবের অবসর দেন নাই।

হিন্দু কলেজের সিনিয়র বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে দেওয়া যাইত। ছাত্রেরা তাহার পর প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া তিন বা চারি বৎসর প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। প্রথম শ্রেণীতে অন্যূন তিন বৎসর অধ্যয়ন করিলে কলেজ পরিত্যাগের সময় ছাত্রগণকে পারদর্শিতা-সূচক প্রশংসাপত্র দেওয়া হইত।

সিনিয়র বৃত্তিগুলির আয়ু ছিল এক বৎসরকাল মাত্র। সুতরাং প্রথম শ্রেণীতে প্রতি বৎসরেই অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে ছাত্রগণ বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিতেন।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূদেববাবু প্রশংসার সহিত সিনিয়র পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়া ৪০৲ টাকার বৃত্তি পান ও দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। ভূদেববাবু তৎপরে প্রথম শ্রেণীতে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ও প্রতি বৎসরই পরীক্ষা দিয়া ৪০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

হিন্দু কলেজ ত্যাগ, চাকুরীর চেষ্টা, ঘোর অর্থাভাব

হিন্দু কলেজে ৬ বৎসর ৫ মাস অধ্যয়নের পর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ভূদেববাবু কলেজ পরিত্যাগ করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী উক্ত কলেজ হইতে নিম্নলিখিত সার্টিফিকেট বা প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন :—

Hindoo College

These are to certify that Bhoodeb Mookerjee has studied in this College for a period of 6 years and 5 months, that at the time of quitting College he was in the first class, that he has made very great progress in General Literature and acquired creditable proficiency in the English Language and Literature and in the Elements of General knowledge and that his conduct has been quite satisfactory. At the time of leaving College he held a Senior Scholarship of the first grade.

Calcutta
13th February 1846

J. Kerr Principal
G. Lewis Head Master

C. H. Cameron
F. Mellet
F. J. Mouat
Rosomoy Dutta M. & Secy
} Managing Committee

C. H. Cameron
F. Mellet
Rosomoy Dutta
F. J. Mouat
} Members of the Council of Education

প্রশংসাপত্রের মর্ম্ম ঃ—ভূদেব মুখোপাধ্যায় হিন্দু কলেজে ৬ বৎসর ৫ মাস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কলেজ পরিত্যাগের সময়ে তিনি প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সাধারণ সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞান প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল এবং ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপক্রমণিকায় তিনি বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তিশালী হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব-চরিত্র সন্তোষজনক ছিল। কলেজ-পরিত্যাগের সময়ে তিনি প্রথম শ্রেণীর সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি ভোগ করিতেছিলেন।

কলেজ ত্যাগ করিবার পর ভূদেববাবু যে ৪০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেছিলেন তাহা বন্ধ হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীও জুটে নাই। একটী দেড়শত টাকা বেতনের হেডমাষ্টারী মাউয়াট সাহেব তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু উহা তাঁহার তদানীন্তন নীতিতে বাধে বলিয়া তাহা লন নাই। তার পর চাকুরীর জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, এমন কি সওদাগরী আফিসের দ্বারে দ্বারে চাকুরীর জন্য ঘুরিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রহ-বৈগুণ্যে, কোথাও চাকুরী জুটাইতে পারেন নাই। এই সময়ে অভাবের বৃশ্চিক-দংশনে তিনি কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরিবারে অন্নকষ্টও উপস্থিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, এই সময়ে হিন্দু চ্যারিটেবল ইনষ্টিটিউশন নামক একটি স্কুল স্থাপিত হয়। হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আপনাদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। মিশনরী স্কুলে ছেলে পড়াইতে দিয়া ছেলেরা খৃষ্টভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে, এই আশঙ্কা তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য, স্কুলে স্বধর্ম্মের প্রতি ছাত্রগণকে শ্রদ্ধাবান্ করিয়া তুলিবার জন্য এই স্কুলটী স্থাপিত হয়। ভূদেববাবু তাঁহার নীতি অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়া মাসিক ৬০৲ টাকা বেতনে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু এই স্কুল বেশী দিন টিকিল না। উহার ফণ্ডের সমস্ত টাকা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত

রাখা হইয়াছিল। ব্যাঙ্ক হঠাৎ দেউলিয়া হইয়া উঠিয়া যাইতে স্কুল ফণ্ডের টাকাগুলিও নষ্ট হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে স্কুলের আয়ুও ফুরাইল।

ভূদেববাবুও আবার অভাবের তাড়নায় পড়িলেন। আবার চাকুরীর চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু একটী চাকুরীও আর তাঁহার ভাগ্যে যেন জুটে না! এই সময়কার ঘটনা সম্বন্ধে ভূদেববাবু তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাঁহার কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট যাহা বলিয়াছিলেন, "বঙ্গভাষার লেখক" নামক পুস্তকে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। আমরা উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"কলেজের পাঠ শেষ হইলে, আবার দুঃখের দশা পড়িল। আর তিনি বৃত্তি পান না,—কাজেই আবার নিদারুণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। তাঁহার (ভূদেববাবুর) সেকালের ডেপুটী মাজিষ্টর হইবার সাধ ছিল। তাঁহার মুরুব্বি রিচার্ডসন সাহেবও তাঁহাকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলেন। কিন্তু হঠাৎ রিচার্ডসন কলেজের কাজ ত্যাগ করিলেন, অন্য একজন নূতন ইংরেজ অধ্যাপক বিলাত হইতে আসিলেন। তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি,—ভয়ঙ্কর ভাব। ভূদেব তাঁহাকেই একদিন আপনার চাকুরীর কথা বলেন। তিনি উত্তর দেন,—"আমি চাকুরী কোথা পাইব? আমি তোমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছি। তুমি সিনিয়র স্কলার হইয়াছ। তোমার দুই চক্ষু, দুই হাত পা আছে, তুমি নিজে চাকুরী খুঁজিয়া লও। আমার কাছে তোমার চাকুরীর কথা উত্থাপন করিবার কালে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল।"

ভূদেব কোনও উত্তর না দিয়া, বিষণ্ণবদনে ঘরে ফিরিলেন। ঘরে গিয়াও সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। কারণ, পিতা বিশ্বনাথ তাঁহাকে চাকুরী করিবার জন্য সদাই উত্যক্ত করেন।

পিতা বলিলেন,—"এ যে আরও দু'বছর কলেজে পড়া তোর পক্ষে

ভাল ছিল। কলেজ উত্তীর্ণ হইয়া, তুই যে সব মাটি করিলি দেখিতেছি। দেখ্ বাছা, যেখানে পাস, একটা চাকরী দেখ্. সংসার যে আর চলে না।”

ভূদেব কলিকাতার কোন সওদাগরী আফিসে চাকরীর উমেদার হইয়া গমন করিলেন। বড় সাহেব ভূদেবের মূর্ত্তি দেখিয়া সদয় হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—“তুমি সওদাগরের ঘরেব কোন কাজ জানো কি?” ভূদেব কহিলেন,—“না, আমি সিনিয়র-স্কলার; নূতন পাস হইয়াছি ” সাহেব দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিলেন,—“না, বাবু! এখানে তোমার চাকরা হইবে না। আমাদের কাজে সিনিয়র স্কলারের কোন আবশ্যকতা নাই। তোমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। দোকানদারী কাজ তোমাদের মত লোকের দ্বারা হইবে না। অতএব তুমি অন্যত্র চাকুরীর চেষ্টা দেখ।”

ভূদেব ভগ্নমনে ঘরে ফিরিলেন। পরদিন আবার অন্য এক সওদাগরি আফিসে গেলেন। সেখানে বড় সাহেব ভূদেবকে তিন মাস কাল বিনা বেতনে এপ্রেন্টিস থাকিতে বলেন। ভূদেব, সাহেবকে সেলাম করিয়া, সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

গ্রহগণ যখন বিগুণ থাকে, তখন মানুষ সহস্র চেষ্টাতেও আশানুরূপ ফল পায় না। ভূদেব,—সিনিয়র স্কলার ভূদেব, কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র ভূদেব,—অধ্যাপকগণের পরম প্রিয়পাত্র ভূদেব, এইরূপ একমাস কাল কলিকাতা সহরে ঘুরিলেন; কিন্তু চাকুরী কোথাও জুটিল না। এই সময়—কলেজে উত্তীর্ণ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে—ভূদেবের বিবাহ হইয়াছিল। একে পিতামাতার সংসার অর্থাভাবে অচল, তাহার উপর বিবাহ-বন্ধন, কাজেই ভূদেব বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে ভূদেব সমস্ত কলিকাতা সহরটা চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরিয়া ফিরিয়া, একহাঁটু ধূলার সহিত শুষ্কমুখে, পিপাসা এবং

ক্ষুধায় কাতর হইয়া, ঘরে ফিরিলেন। ঘরের নিকটে গিয়া শুনিলেন, পিতা-মাতায় কিঞ্চিৎ কলহ উপস্থিত হইয়াছে। ঘরে আর ভূদেব ঢুকিলেন না। দ্বারদেশেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাতা বলিতেছেন,—"বৌকে একবার আনিতে হইবে।" পিতা বলিতেছেন,—"ঘরে আমাদের এক সের চাল নাই। আমি আধ-পেটা খাই, তুমিও আধ-পেটা খাও। এস্থলে বৌ আনিয়া ফল কি?" মা বলিতেছেন,—"তথাচ বৌ আনিতে হইবে। সেও আমাদের সঙ্গে আধ-পেটা খাইয়া থাকিবে।" বাপ বলিতেছেন,—"তোমাদের স্ত্রী বুদ্ধি; তোমরা সংসার ভাল বুঝ না; এই ভূদেবের একটী চাকুরী হইলেই, আমি বৌ ঘরে আনিব। এখন ক্ষান্ত হও।" মাতা বলিলেন,—"আমি ক্ষান্ত হইব না; আমি যেমন করিয়া হউক,—নিজে না খাইয়া বৌকে খাওয়াইব।" পিতা এই সময় বলিলেন,—"ছেলেটা যে কি হইয়া উঠিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। উহার মুখ চাহিয়া আমরা আছি। কিন্তু এই হতভাগ্য লোকের হতভাগ্য ছেলের আজিও পয়সা আনিবার শক্তি হইল না।"

ভূদেবের বুকে পিতার বাক্য-বাণ বাজিল। ভূদেব ঘরে না ঢুকিয়া অমনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হাতে একটীও পয়সা নাই। তিনি পায়ে হাঁটিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে চুঁচুড়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন।

* * *

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। ভূদেব আপন মনে চুঁচুড়ার পথে পথে ফিরিতেছেন। কোন চুঁচুড়াবাসী তাঁহাকে চিনে না। তিনিও তত্রত্য কোনও অধিবাসীকে চিনেন না। প্রায় ১২ ঘণ্টার অধিককাল তিনি চুঁচুড়ায় আসিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ভূদেবকে একবার ডাকিয়াও কেহ বলে নাই,—"তুমি কে? কোথায় যাইবে? কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন? কি নিমিত্ত এরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?"

অপরিপক্কবুদ্ধি যুবক ভূদেব প্রায় ৩৬ ঘণ্টা কাল অনাহারে আছেন। * * * জঠর-জ্বালা বড় জ্বালা। ভূদেবের উদর জ্বলিয়া উঠিল। আর সহ্য হয় না, ভূদেবের তখন মনে হইতে লাগিল, "আহা অন্ন কি উপাদেয় সামগ্রী! আমি অন্ন খাইব! অন্ন খাইব! আর যে দাঁড়াইতে পারি না। অন্ন কৈ? কোথা গেলে অন্ন পাই?"

ভূদেব দেখিলেন,—সম্মুখে এক অট্টালিকা। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটী ভাবিয়া, ভূদেব তাহাতে প্রবেশ করিলেন। বাটীর কর্ত্তা বৃদ্ধ; গলায় যজ্ঞোপবীত। ভূদেব ম্লান-মুখে নীরবে তাঁহার নিকট দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি বাপু? কি চাও? তোমার মুখ এমন শুক্‌নো কেন?"

ভূদেব।—আজ দেড়দিন কাল আমার আহার হয় নাই। আমি চাট্টি ভাত খাব।

বৃদ্ধ।—এসো বস। ঝারিতে জল আছে; হাত-পা ধোও; মুখ ধোও।

ভূদেবের পায়ে জুতা ছিল না। এক পা ধুলো। ভূদেব হাত-পা-মুখ ধুইয়া, বৃদ্ধের নিকট গিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিলেন,—তুমি অতি সুপুরুষ। তোমার শরীরের চিহ্নসমূহ অতীব সুলক্ষণযুক্ত। তোমাকে বিশেষ বুদ্ধিমান যুবক বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি খাইতে পাও না কেন? বাটী হইতে কি ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছ?

ভূদেব।—না।

বৃদ্ধ।—তোমার নাম কি?

ভূদেব।—আমার নাম শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বৃদ্ধ।—আচ্ছা, পরে তোমার পরিচয় লইব। এক্ষণে কথা এই, হঠাৎ তোমার (দেড়দিনের পর) অন্নাহার করিয়া কাজ নাই; আগে

তুমি সরবৎ পান কর; কিঞ্চিৎ সুস্থ হও; তার পর, অন্ন আহার করিও।”

ভূদেবের জন্য অবিলম্বে চিনির সরবৎ এবং বেলের সরবৎ আনীত হইল। স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া, ভূদেব তাহা পান করিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে অন্ন প্রস্তুত হইল। রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়াছে। বৃদ্ধ আপন সন্তানগণের সহিত ভূদেবকে আদরে লইয়া গেলেন। কুমার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় রূপবিশিষ্ট একটী ব্রাহ্মণসন্তান আজ দেড়দিন কাল অনাহারে আছেন, অদ্য আহার করিবেন,—ইহা শুনিয়া, ভূদেবকে দেখিবার জন্য অনেক বৌ-ঝি একত্র হইলেন। গৃহকর্ত্রী যতদূর সম্ভব, আজ স্বয়ং উত্তমরূপে রন্ধন করিলেন। রূপার থালে অন্ন, দুগ্ধ, ক্ষীর, ঘৃত, পায়স, সন্দেশ—কিছুরই অভাব ছিল না। ব্যঞ্জন আট রকমের কম নহে। আদেশমত ভূদেব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু অন্নাহার করিবেন কি, চোখের জলে ভূদেবের মুখ-বুক ভাসিয়া গেল। বস্ত্রের দ্বারা ভূদেব যতই চক্ষু মুছেন, ততই চক্ষু দিয়া অবিরামধারে অশ্রু নির্গত হয়। ভূদেব ভাতে হাত দিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিলেন,— “ভূদেব তুমি কাঁদিতেছ কেন? তুমি খাও। কান্না কিসের?”

ভূদেব কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর দিলেন,—“আমার মা খাইতে পান না—বাবা খাইতে পান না,—স্ত্রী খাইতে পান না,—আমি এ রাজভোগ—বিবিধ বিচিত্র সামগ্রী কেমন করিয়া উদরস্থ করিব? আমাকে মোটা চালের ভাত, শাক এবং লবণ দিন,—আমি তাহা খাইয়াই প্রাণ ধারণ করিব।”

বৃদ্ধ ভূদেবকে অনেক বুঝাইলেন। ভূদেব অন্নাহার করিলেন। কিন্তু বেশী খাইতে পারিলেন না। আটভাগের একভাগ সামগ্রী, ভূদেবের উদরস্থ হইল কি না সন্দেহ। এই বৃদ্ধের ভবনে, ভূদেব, বৃদ্ধের সন্তান ও নাতিগণের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তিনি এখানে

খাইতে পরিতে পাইতেন এবং মাসিক আট টাকা করিয়া বেতন পাইতেন। * * মাসে মাসে ভূদেব ঐ টাকা পিতার নিকট পাঠাইতেন। আট টাকাতেই পিতার স্বচ্ছন্দে সংসার চলিত। ঐ বৃদ্ধের সাহায্যে শীঘ্র চন্দননগরে একটী স্কুল স্থাপিত হয়। ভূদেব তথায় ষোল টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হন। সুতরাং ভূদেবের এখন মাসিক আয় হইল ২৪৲ টাকা। সুখে সংসার চলিতে লাগিল।

ভূদেব যখন চুঁচুড়ায় থাকেন, তখন অর্থের দিকে তাঁহার তাদৃশ প্রবৃত্তি ছিল না। মাসিক ২৪৲ টাকাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ, ইহাতেই তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ উত্তমরূপে চলিত। বড় চাকুরী করিব,—বড়লোক হইব,—এ বড় সাধে তখন তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা ছিল—"দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার করিব।"

এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন,—"তিনি মিশনারীদিগের ন্যায় নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যা প্রচার করিবেন. এই এক নূতন আমোদে মত্ত হইলেন এবং তদনুসারে কয়েকজন বান্ধবের সহিত শেয়াখালা, চন্দননগর, শ্রীপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া, স্বয়ং সেই সকল স্কুলের অধ্যাপকতা কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু যেরূপ অর্থবলে ও লোকবলে মিশনারীরা স্কুল-স্থাপনাদি কার্য্যে কৃতকার্য্য হন, এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের সে সকল কিছুই ছিল না। কেবল মন ছিল। কিন্তু সংসারে শুদ্ধ এক মনের বলেই সকল কার্য্য সাধিত হয় না সুতরাং কয়েক বৎসর পরেই তাঁহাকে সে আমোদ ত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য উপায়ান্তরের চেষ্টা দেখিতে হইল।"

ভগিনীর বিবাহে ঋণ

ভূদেববাবু এইভাবে একবৎসর কাল শিক্ষাবিস্তারের কার্য্যে নিযুক্ত

আছেন। মধ্যে মধ্যে কলিকাতার বাড়ীতে আসেন। ইতিমধ্যে তাঁহার দ্বিতীয়া ভগিনীর বিবাহের দিন স্থির হইল। ভূদেববাবু একদিন বাড়ীতে চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার পিতা তর্কভূষণ মহাশয় প্রতিবেশী শম্ভু ঘোষকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে রোয়াকে আসিয়া বসিলেন। তখন সন্ধ্যা। তর্কভূষণ শম্ভু ঘোষকে বলিলেন,—শম্ভু বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে এখন টাকার জোগাড় হইলেই হয়। তুমি আমাকে আড়াই শত টাকা ঋণ দিতে পারিবে কি!"

শম্ভু। বড় আহ্লাদের কথা! কোথায় হোলো—সেই সোদপুরেই নাকি! আড়াই শত টাকার জন্য আপনার কাজ আটকাইবে না। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। বাবু তো খুব বিদ্বান্ হইয়াছেন, চল্লিশ টাকা জলপানি পাইয়াছিলেন, তিনি কি এখন কিছুই উপার্জ্জন করেন না? এখনও আপনার কষ্ট ঘুচিল না?"

তর্কভূষণ। অদৃষ্টে যদি দুঃখ থাকে, তাহা হইলে কে তাহা ঘুচাইবে বল?

পিতার এই কথায় তাঁহার মর্ম্মস্থল যেন সূচিকাবিদ্ধ হইল। অনুতাপে, দুঃখে, কষ্টে তিনি যেন জীবন্তে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি দশের উপকার করিতে যাইতেছেন ভাল কথা, কিন্তু পারিবারিক কর্ত্তব্যে অমার্জ্জনীয় অবহেলা করিতেছেন। আত্মগ্লানিতে পূর্ণ হইয়া ভূদেববাবু তখনই বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, এবং তাঁহার বন্ধু ৺স্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ২৫০৲ টাকা ধার করিয়া আনিলেন। সেই রাত্রিতেই সেই টাকা তিনি পিতার হস্তে দিলেন। পিতা মনে করিলেন,—ইহা পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থ।

মাদ্রাসায় শিক্ষকের পদগ্রহণ

সেই রাত্রি প্রভাত হইল। ভূদেবের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। আত্মগ্লানির জ্বালায় কি নিদ্রা হয়? পরদিন তিনি শিক্ষা-পরিষদের

মাউয়াট সাহেবের সহিত দেখা করিলেন। মাউয়াট সাহেব তাঁহাকে মাদ্রাসা কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। বেতন— মাসিক ৫০৲ টাকা। মাদ্রাসার মাহিনার টাকা হইতে ভূদেববাবু প্রতি মাসে ২৫৲ টাকা করিয়া পিতার হাতে দিতেন। ৫০৲ টাকা মাহিনার মধ্যে ২৫৲ টাকা মাত্র দিলেও পিতা এজন্য কখনও পুত্রের কৈফিয়ৎ তলব করেন নাই।

হাবড়া স্কুলের হেড মাষ্টার

ইহার কিছুদিন পরেই ভূদেববাবু হাবড়া স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হন। এই পদে বহাল হইবার পর তিনি প্রতি মাসে ৭৫৲ টাকা করিয়া পিতাকে দিতেন। এইরূপে ভূদেববাবু পৃথকভাবে যে টাকা রাখিতেন তাহাতেই স্বরূপবাবুর দেনা শোধ হইয়া গেল। অঋণী হইবার পর তিনি অর্দ্ধেক টাকা প্রতিমাসে ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে লাগিলেন। এই সঞ্চয়-ব্যবস্থার গুণেই ভূদেববাবু ৪৫ বৎসর পরে দেড় লক্ষ টাকায় বিশ্বনাথ ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ভূদেবাবু যখন হাবড়া স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হন সেই সময়ে জেলা স্কুলের হেড মাষ্টারের পদগুলি ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়দিগের একচেটীয়া ছিল। প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি হিন্দু কলেজের সিনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণই দেশীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে এই পদ পাইয়াছিলেন। ভূদেব বাবু ছয় বৎসর আট মাস হাবড়া স্কুলে ছিলেন।

হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক

মফঃস্বলের বাঙ্গালা স্কুলসমূহের জন্য শিক্ষক তৈয়ারী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টনর্ম্ম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন। হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট প্র্যাট সাহেব ভূদেববাবুকে বলেন,—আপনি হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুল হেড মাষ্টারের পদপ্রার্থী হইয়া প্রতিযোগী পরীক্ষা দিন। ভূদেববাবু

তাঁহার অনুরোধেই প্রতিযোগী পরীক্ষা দেন ও উক্ত পদ লাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই পদে তাঁহার বেতন হয় মাসে ৩০০৲ টাকা।

ভূদেববাবুর অধ্যক্ষতাগুণে হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুল উন্নতির চরমসীমায় আরোহণ করে। এই সময়ে নর্ম্ম্যাল স্কুলের ছাত্রদের পাঠের উপযোগী পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না বলিলেই হয়। ভূদেববাবু নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের জন্য অনেকগুলি পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, ইউক্লিডের জ্যামিতি ৩য় অধ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসও এই সময়ে রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল।

ভূদেববাবুর শিক্ষাদানপ্রণালী অতি সুন্দর ছিল। তিনি এমন ভাবে ছাত্রদিগকে পাঠ্য বিষয় বুঝাইয়া দিতেন যে তাহা ছাত্রগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইত। এ সম্বন্ধে ভূদেববাবুর ছাত্র স্বর্গীয় তারকনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন ঃ—

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইবার কালে আমরা কয়েক জন তাঁহার প্রথম ছাত্র হই ; আমাদের কয়েক জনকে দার্শনিক পণ্ডিত করিবার জন্য ভূদেববাবু কিছু অধিক দিন নিকটে রাখেন। শিক্ষাসৌষ্ঠব ও উপদেশকৌশল তিনি যে কি রূপ জানিতেন তাহা যাঁহারা অন্ততঃ একদিন মাত্রও তাঁহার কাছে পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। গণিত অথবা ক্ষেত্রতত্ত্বাদি শিক্ষা দিবার সময়ে খড়ি হাতে করিয়া ভূদেববাবু যখন বোর্ডে অঙ্কপাত করিয়া বলিতে আরম্ভ করিতেন, তখন বোধ হইত যে, এক একটী ভূদেববাবু এক একটী ছাত্রের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এরূপ কোন

ছাত্র ছিল না যে, বুঝিতে পারিলাম না বলে ; বুঝিতে না পারা দূরে থাকুক, বোধ হইত উপদেশবাক্যগুলি একেবারে পাথরে খোদিতের ন্যায় হৃদয়ে অঙ্কিত হইল। ইহা ব্যতীত ভূদেববাবু ছাত্রদিগের সহিত এরূপ কথা কখন বলেন নাই বা এরূপ গল্প কখন করেন নাই, যাহাতে ছাত্রদিগের কিছু না কিছু জ্ঞানলাভ না হইত। অপিচ ছাত্রসম্বন্ধে ভূদেববাবুর আর একটি অসাধারণ গুণ দেখা যাইত যাহা একান্তই দুর্ল্লভ। ভূদেববাবুর প্রত্যেক ছাত্রই মনে করিত ভূদেববাবু সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে অধিক ভালবাসেন ; সকলেরই মনে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস ছিল।"

জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যু

ছয় বৎসর ভূদেববাবু হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ভূদেববাবুর প্রথম পুত্র মহেন্দ্রদেবের মৃত্যু হয়। মহেন্দ্রদেবের তখন বয়স হইয়াছিল মাত্র দ্বাদশ বৎসর। বার বৎসর বয়সেই মহেন্দ্রদেব প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রায় সমস্ত পাঠ্য বিষয়ই পড়িয়া ফেলিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যুতে ভূদেববাবু অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে তিনি সে শোক জয় করিয়াছিলেন।

চুঁচুড়ায় বাড়ী

ভূদেববাবু এতদিন বাসা ভাড়া করিয়া চুঁচুড়ার মাধবীতলায় অবস্থান করিতেন। শেষে চুঁচুড়া বড়বাজারে গঙ্গাতীরে বাড়ী তৈয়ারী করেন। ভূদেববাবুর পিতা চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরের বাড়ীতে আসিয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কলিকাতার বাসা উঠিয়া গেল এবং চুঁচুড়ায় ভূদেববাবুর পরিবারবর্গের বাসস্থান হইয়া পড়িল

প্রথমা কন্যার বিবাহ

ভূদেববাবুর প্রথম পুত্রের পর তাঁহার এক কন্যা হয়। ইহার বিবাহ হরিতকী বাগানের বাড়ীতে নব-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ বারাসত-নিবাসী ৺তারাপ্রসাদ চট্টো-পাধ্যায়ের সহিত হইয়াছিল। ইনি প্রথমে কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়া পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই বিবাহ হইয়াছিল।

দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ

উত্তরপাড়ার ৺ বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ভূদেববাবুর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি হাইকোর্টের উক ল এবং উত্তরপাড়া হিতকরী সভার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার পিতা ৺ জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একান্ত নিকট জ্ঞাতির জামিন হইয়া ৫০ হাজার টাকার দায়ে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রদ্বয় (জ্যেষ্ঠ ভূদেববাবুর জামাতা ৺ বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কনিষ্ঠ এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ ৺ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) কৃতী হইয়া ক্রমশঃ এই ঋণ পরিশোধ করেন। ভূদেববাবুর কন্যা এক পুত্র (৺ ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যুক্ত প্রদেশের মুন্সেফ হইয়াছিলেন) এবং এক কন্যা (স্বামী উত্তরপাড়ার জমিদার শ্রীযুত রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায়) রাখিয়া যান।

তৃতীয়া কন্যার বিবাহ

ভূদেববাবুর তৃতীয়া কন্যার সহিত সুবর্ণপুরের ৺ শিবনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের বিবাহ হয়। তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তী হইয়া মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক হন এবং

অধ্যাপনা-কার্য্যে প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তৎপরে বি-এল পাশ হইয়া কিছুদিন উনাও ও পাটনায় ওকালতি করেন। অতঃপর কিছুকাল হুগলী কলেজে আইনের অধ্যাপনা করিয়া পরে ভাগলপুরের উকীল হন এবং সেইখানেই বসবাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র ; শ্রীযুত অনাদিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুরের উকীল এবং শ্রীযুত অনন্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিহার প্রদেশের মুন্সেফ।

সহকারী ইনস্পেক্টরের পদপ্রাপ্তি

স্কুল-ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব ছয় মাসের ছুটী লইয়া বিলাত যাইলে জিয়লজিক্যাল সার্ভে বিভাগের মিঃ মেডলিকট তাঁহার স্থানে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হন। উড্রো সাহেবের সুপারিশে ও স্যর এসলী ইডেনের অনুমোদনে ভূদেববাবুকে মিঃ মেডলিকটের সহকারী নিযুক্ত করা হয়। এই পদটী ছয় মাসের জন্য নূতন সৃষ্টি হইয়াছিল। ভূদেববাবু ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ৪০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে ভূদেববাবু এই পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার পদের নাম হয়—স্কুল-সমূহের অতিরিক্ত ইনস্পেক্টর।

ভূদেববাবুর পিতার মৃত্যু

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ভূদেববাবুর মাতৃদেবী স্বর্গারোহণ করেন। তাহার পর তাঁহার পিতৃদেব তর্কভূষণ মহাশয় ২৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভাদ্র মাসে তর্কভূষণ মহাশয় সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ভূদেববাবুর পিতৃশ্রাদ্ধ হরিতকী বাগানের বাটীতে হইয়াছিল। পিতৃশ্রাদ্ধে ভূদেববাবু যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বিদায়, কাঙ্গালী-বিদায়, ব্রাহ্মণ-

ভোজন, সাধারণ ভূরিভোজন প্রভৃতি যথোচিতভাবেই হইয়াছিল। কাশী, মিথিলা প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল ও তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এডুকেশন গেজেট

ভূদেববাবু যখন হাবড়া স্কুলের হেডমাষ্টার সেই সময়ে হজসন প্রাট সাহেব (হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট) বিহার, উড়িষ্যা ও পশ্চিম বাঙ্গালা—এই তিন প্রদেশের অংশ-সংশ্লিষ্ট "পশ্চিম সার্কেলে"র স্কুল-সমূহের ইনস্পেক্টর বা পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই প্রাট সাহেব ভূদেববাবুর গুণমুগ্ধ বন্ধু ছিলেন।

এই সময়ে ভাস্কর নামক একখানি সংবাদপত্রে গবর্মেণ্টের কোন সৎকার্য্যের অযথা সমালোচনা হয়। প্রাট সাহেব তাহা পাঠ করিয়া উহা ভূদেববাবুকে পড়িতে বলেন। ভূদেববাবুর পড়া শেষ হইলে সাহেব জিজ্ঞাসা করেন,—কাগজের মন্তব্য কি ঠিক? ভূদেববাবু বলেন,—না।

প্রাট।—দেখুন দেখি, এরূপ লেখা তবে কতদূর অন্যায়?

ভূদেব।—লেখকের ইহাতে দোষ নাই।

প্রাট।—অন্যায় লেখায় দোষ নাই কেন?

ভূদেব।—গবর্ণমেণ্টের নীতি দেশীয়গণকে বুঝাইয়া দিবার উপায় এ পর্য্যন্ত আপনারা করেন নাই। সুতরাং দেশীয়গণ অনুমানে যাহা বুঝেন সেইরূপই লিখেন। গবর্ণমেণ্টের নীতি ও উদ্দেশ্য সাধারণকে বুঝাইবার জন্য সরকারের একখানি সংবাদপত্র প্রচার করা উচিত।

কথাগুলি প্রাট সাহেবের মনে লাগিল। তিনি উহা গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন। গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিলেন,—পরামর্শ যুক্তি-সিদ্ধ। তাঁহারা প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন। ইহাই সাপ্তাহিক এডুকেশন গেজেট নামক সংবাদপত্রের উৎপত্তির মূল।

গ্রাট সাহেব ভূদেববাবুকেই এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দেশীয় কোনও ব্যক্তিকে রাজনৈতিক সংবাদাদি-প্রদানে সঙ্কোচ বোধ করায় লণ্ডন মিশনের রেভারেণ্ড স্মিথ উহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন (১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ)। তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন 'পদ্মিনী'-রচয়িতা স্বর্গীয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। রেভারেণ্ড স্মিথ বিলাত চলিয়া যাইলে গবর্ণমেণ্ট ৺ প্যারিচণ সরকার মহাশয়কে মাসিক ৩০০৲ টাকা বেতনে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক নিযুক্ত করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলপথের শ্যামনগর ষ্টেশনে ট্রেণ-সংঘর্ষ হইয়াছিল। ইহাতে হতাহতের সংখ্যা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টের প্রতি লোকের সন্দেহ হইয়াছিল। এডুকেশন গেজেটে এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট ৺ প্যারীচরণ সরকারকে কিছু অনুযোগ করেন। ইহার ফলে তিনি কার্য্যে ইস্তফা দেন।

অতঃপর শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ভূদেববাবুকে ইহার সম্পাদক হইবার জন্য অনুরোধ করেন। ভূদেবাবু বলেন,—গ্রাট সাহেবের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আপনারা আমাকে প্রথমে সম্পাদক-পদ দেন নাই, স্মিথ সাহেবকে দিয়াছিলেন। তার পর স্মিথ সাহেব বিলাত যাইলে প্যারীবাবুকে সম্পাদক করিলেন, আমাকে করিলেন না। আমি দুইবার উপেক্ষিত হইয়াছি, এখন আমি ইহার সম্পাদক হইতে ইচ্ছা করি না।

বাস্তবিক সে সময়ে এডুকেশন গেজেটের দুর্নাম রটিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট কাগজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য খ্যাতনামা কোন ব্যক্তি উহার সম্পাদক হন ইহাই পাইতেছিলেন। সেইজন্য শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর আটকিনসন সাহেব ভূদেববাবুকে সম্পাদক হইবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি উহা প্রত্যাখ্যান করিলে আটকিনসন

সাহেব তদানীন্তন ছোট লাট গ্রে সাহেবকে তাহা জানান। গ্রে সাহেব আটকিনসন সাহেবকে বলেন—আপনি গিয়া ভূদেববাবুকে বলুন,—'আমার ইচ্ছা যে তিনি ইহার সম্পাদক হউন।'

আটকিনসন সাহেব ছোটলাটের এই কথাগুলি ভূদেববাবুকে বলিলে তিনি বলিলেন,—ছোটলাটের কথা অবশ্য শিরোধার্য্য, কিন্তু প্যারীচরণ বাবু যে পত্র উচ্ছিষ্ট করিয়া ঘৃণার সহিত ফেলিয়া দিয়াছেন তাহা ঠিক সেই অবস্থায় আমি গ্রহণ করিব না; উহাকে সংস্কার করিয়া আমাকে দিউন। যদি গবর্ণমেণ্ট কাগজখানির মৌলিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করেন অর্থাৎ উহার সম্পূর্ণ স্বত্ব আমাকে দেন এবং যে ৩০০৲ টাকা সম্পাদককে বেতন বলিয়া দেওয়া হইতেছে তাহা যদি সাহায্য-হিসাবে আমাকে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমি উহা লইতে ও উহার সম্পাদক হইতে সম্মত আছি।

এই সর্ত্তেই গবর্মেণ্টে সম্মত হইলেন তদবধি এডুকেশন গেজেট ভূদেববাবুর হস্তে আসিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ভূদেববাবুর সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটের প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। "ভূদেব-রচিতে" লিখিত আছে,—"স্মিথ সাহেবের ও প্যারীচরণ বাবুর সময়ে এডুকেশন গেজেটের বর্ষগণনা ইংরেজী হিসাবে হইত। ভূদেব-বাবুর হস্তে আসার পর প্রথম বৈশাখ আসিতেই তিনি সেই মাসের প্রথম সংখ্যাকে "নূতন সন্দর্ভ—১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা" অভিহিত করিয়া দেশীয় বর্ষগণনার মধ্যে আনিয়া দিলেন। 'এডুকেশন গেজেট সর্ব্ব-প্রকার শিক্ষা-প্রচারেই নিযুক্ত থাকিবে এবং একাধারে সম্বাদ পত্র এবং মাসিক পত্র, এবং ত্রৈমাসিক পত্রেরও কাজ কতকটা করিবে'—তাঁহার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল। ৺গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বৈজ্ঞানিক বিবরণ' সংগ্রহ করিয়া ইহাতে লিখিতেন; বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী ৺পুলিনবিহারী ভাদুড়ি 'বাণিজ্যবার্ত্তা' এবং ৺দ্বারকানাথ

চক্রবর্ত্তী (উকীল) 'হাইকোর্টের নজীর' লিখিয়া পাঠাইতেন। ভূদেববাবুর হাওড়া স্কুলের ছাত্র ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য (কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব ইঞ্জিনিয়ার) হুগলী থাকা কালে ইহাতে নিয়মিতভাবে লিখিতেন। কবিরাজ ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর কবিতাবলী—ভারতবিলাপ এবং ভারতসঙ্গীত প্রভৃতি; ৺দীনবন্ধু মিত্রের, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এবং ৺নবীনচন্দ্র সেনের (অবকাশ রঞ্জিনীর) কবিতা এবং ছোয়ান পক্ষীর (৺শিবদাস ভট্টাচার্য্যের) বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও সমালোচনা এই সময় হইতে প্রকাশিত হওয়ায় অচিরেই এডুকেশন গেজেট সে সময়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্র বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছিল। ভূদেববাবু নিজেও এডুকেশন গেজেটে নিয়মিত ভাবে লিখিতেন। এডুকেশন গেজেটেই তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, বাঙ্গালার ইতিহাস তৃতীয় ভাগের শেষাংশ এবং বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত প্রবন্ধের অধিকাংশ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।"

শিক্ষা-দর্পণ

এডুকেশন গেজেটের ভার লইবার পূর্ব্বে ভূদেববাবু শিক্ষা-দর্পণ নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলেন। যখন ভূদেববাবুর কনিষ্ঠ পুত্র সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বয়স দুই বৎসর মাত্র, সেই সময়ে শিক্ষা-দর্পণের প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছিল। কাগজখানি ভূদেববাবুর বুধোদয় যন্ত্রেই ছাপা হইত। এই ছাপাখানা তাঁহার চুঁচুড়ার বাটীর একাংশে অবস্থিত ছিল। শিক্ষাদর্পণ বাহির হইলে ডাকে পাঠাইবার কাজ বাড়ীর লোকেই করিতেন। একবার কাগজ ডাকে পাঠাইবার সময়ে সিদ্ধেশ্বর বলিয়াছিল—"আমার কাগজ।" ভূদেববাবু তাহা শুনিয়া ছাপাখানার অধ্যক্ষ ৺কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কৌতুক

করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ইহা সিধুরই কাগজ হইল; হিসাবপত্র ওর নামেই রাখা হইল ও যখন বড় হইবে তখন ওই এই কাগজ চালাইবে।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র সাত বৎসর বয়সে সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু হয়। শিক্ষাদর্পণ পাঁচ বৎসর চলিয়াছিল; তাহার পর উহা বন্ধ হইয়া যায়। সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বেই এডুকেশন গেজেট ভূদেববাবুর হাতে আসিয়াছিল।

পদোন্নতি ও উপাধিলাভ

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ভূদেববাবু শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতর শ্রেণীতে (মাসিক বেতন ৫০০৲ হইতে ৭০০৲ টাকা) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোনও ভারতীয় ভদ্রলোককে এই শ্রেণীতে ইনস্পেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় নাই। তাহার পর ভূদেব-বাবু বিভাগীয় ইনস্পেক্টরের পদে মাসিক ১৫০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ভূদেববাবু সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

কাশীধামে বাস ও বিশ্বনাথ ফণ্ড

ভূদেববাবু কর্ম্মবীর ছিলেন। পেন্সন লইয়া তিনি ৺কাশীধামে গমন করেন এবং তথায় কিছুদিন বেদান্ত পাঠ করেন। কর্ম্মবীরের কর্ম্মে বিরতি ছিল না। কিন্তু তিনি যে দানবীর ছিলেন এবং সংস্কৃত ভাষার পুষ্টি ও বিস্তারকল্পে তাঁহার যে আন্তরিক অনুরাগ ছিল তাহা তাঁহার দেড়লক্ষ টাকা দানেই বুঝিতে পারা যায়। দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান ভূদেব—আজীবন শিক্ষকতা-ব্রতে ব্রতী ভূদেব সংস্কৃত ভাষার

উন্নতিকল্পে ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের রক্ষাকল্পে তাঁহার আজীবনের সঞ্চিত যে দেড়লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন,—সেই দানের সাত্ত্বিকতা ও মহত্ত্ব সহজেই অনুমান করা যায়। এই দানের জন্য তিনি যে দেশের দানবীরগণের তালিকা মধ্যে সম্মানজনক আসন অধিকার করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

পত্নীর স্বাস্থ্যভঙ্গ

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ভূদেববাবুর কনিষ্ঠ পুত্র সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু হয়; তাহার পর হইতেই ভূদেববাবুর পত্নীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। প্রথমে ভূদেববাবু বাঁকিপুরের মুরাদপুর মহল্লায় একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া পরিবারবর্গকে তথায় রাখেন। তাহার পর ৺কাশীধামে ত্রিপুরা ভৈরবীতে বাসা করেন। কাশীতে আসিয়া ভূদেববাবুর পত্নীর স্বাস্থ্য কিছু ভাল হইয়াছিল।

পরিদর্শনকালে ভূদেববাবু কিছুদিন বজরা ব্যবহার করেন ও পত্নীকেও সঙ্গে রাখেন। ইহাতে তাঁহার নিজের স্বাস্থ্য ভাল হইয়াছিল বটে, কিন্তু পত্নীর স্বাস্থ্যের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই।

ঘোড়ায় চড়া

৪৫ বয়সে ভূদেববাবু ঘোড়ায় চড়া শিখিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে লিখিয়াছিলেন,—গোবিন্! কল্য বৈকালে এমন একটি কাজ করিয়াছিলাম যাহা ইহজন্মে কখন করা হয় নাই—ঘোড়া চড়িয়াছিলাম; পড়িয়া যাই নাই। প্রথমে শরীর এবং মাথা একবার কেমন কেমন করিয়াছিল। হঠাৎ ভূমিকম্প উপস্থিত হইলে ঠিক ঐরূপ হয়। কিন্তু শীঘ্রই ঐ ভাব সারিয়া গেল; যদিও আসনে জোর পাইলাম না তথাপি বোধ হইল যেন ঘোড়া নড়িলেও পড়িয়া যাইব না। লাগামটী এক হাতে ধরিতে

পারি নাই; যে পর্য্যন্ত তাহা না শিখিতেছি সে পর্য্যন্ত শান্তভাবেই থাকিব। ইহার পর ভূদেববাবু নিজের ব্যবহারের জন্য একটা ভূটিয়া টাট্টু কিনিয়াছিলেন। উহা খুব ঠাণ্ডা ছিল বলিয়া উহার নাম রাখিয়াছিলেন—"শান্ত"।

কবিবর হেমচন্দ্রের "ভারত-বিলাপ"

"ভূদেব-চরিতে" এ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা এই:—"৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'হতাশের আক্ষেপ' ১৮৬৯ অব্দের ২৯শে জানুয়ারী এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। তাহার পর মধ্যে মধ্যে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাবলীর অনেকগুলি উহাতে প্রকাশিত হয়। তিনি মধ্যে মধ্যে (তাঁহার প্রিয় বন্ধু এবং ভূদেববাবুর জামাতা) ৺বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত চুঁচুড়ার বাড়ীতে আসিয়া ভূদেববাবুর সহিত দেখা করিতেন। ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের কথা অনেকই হইত। হেমবাবু স্বদেশভক্তিতে পরিষিক্ত হইয়া ভূদেববাবুরই বিশেষ প্রীতির জন্য "ভারতসঙ্গীত" লিখিয়া পাঠাইলে ভূদেববাবু বলিয়া পাঠান, "জন কত শ্বেত প্রহরী পাহারা দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধাঁ"—বাক্যটা ভারতের সম্মেলন সাধন জন্য বিধি প্রেরিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে উল্লেখ করে; উহা ঠিক নয়। বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করিয়া কিছু লিখিতে হইলে নরম সুরই সঙ্গত। তাহাতে হেমবাবু ভারতবিলাপ লিখিয়া পাঠান। উহাতে ভূদেববাবুর উপরোক্ত পরামর্শের এবং পূর্ব্বের লিখিত অপ্রকাশিত "ভারত সঙ্গীতে"র প্রতি লক্ষ্য আছে—ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর, নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার। সেটী (১০ই জুন ১৮৭০) প্রকাশিত হইল। কিন্তু ভারতসঙ্গীতের ন্যায় অতুল্য স্বদেশভক্তির উদ্দীপক কবিতাটী প্রকাশ না করায় দেশের ক্ষতি, এই বিবেচনায় ভূদেববাবু

উহাকে ঐতিহাসিক চিত্রে পরিবর্ত্তিত করাইয়া দেন। এডুকেশন গেজেটে যখন উহা প্রকাশিত হইল, তখন উহাতে 'শিবাজী নয়নে হানিয়া বিজলী'' ছিল এবং "সুগৌরাঙ্গতনু সন্ন্যাসীর ঠাট" অংশ বর্জ্জিত হইয়াছিল। ভূদেববাবু বলিতেন,—ঐতিহাসিক চিত্রের মধ্যে স্বদেশ-ভক্তির উদ্দীপক কথা দিলে মনও সরস হয়, উচ্চভাবেরও আলোচনা হয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে শান্ত সংযত হিন্দুর দেশে আইনভঙ্গের বা রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য উত্তেজনাও হয় না।"

"১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুলাইয়ের এডুকেশন গেজেটে "ভারত-সঙ্গীত" প্রকাশিত হইলে গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টার রবিনসন সাহেব এক বিভ্রাট ঘটাইয়া ফেলিলেন। তিনি "যবন" শব্দের অনুবাদ করিলেন 'বৈদেশিক' (ফরেনার) এবং মহারাষ্ট্রীয় 'শিবাজী'কে ঐতিহাসিক ভাব-বর্জ্জিত করিয়া "শিউজী" বানান করিলেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে উভয় কবিতার জন্য কৈফিয়ৎ তলব হইল। ভূদেববাবু "ভারতে বিলাপ" সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—"উহার বিরুদ্ধে বড় জোর এই বলা যাইতে পারে যে, ইহজন্মের ভাল ভাল জিনিষের অংশ ইংরাজেরাই অধিক এবং এ দেশীয়েরা কম পাইয়া থাকেন—লেখকের ইহাতে দুঃখ প্রকাশ আছে।" ভারতসঙ্গীত সম্বন্ধে দেখাইলেন যে, উহা ঐতিহাসিক চিত্র এবং যবন শব্দে বৈদেশিক বুঝায় না, আইওনীয়, বা গ্রীক বুঝাইত; কিন্তু এখন মুসলমানকেই বুঝায়। ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গলে লিখিয়া গিয়াছেন—

যবন হইতে ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥

এখানে যবনে এবং ফিরিঙ্গী বা ফ্রাঙ্ক বা ইউরোপীয়তে সুস্পষ্টই প্রভেদ করা হইয়াছে। 'শিউজী'র এবং 'বৈদেশিকে'র জন্য রবিনসন সাহেব একটু তিরস্কার খাইয়া ব্যাপারটা শেষ হইল।

পরলোক-গমন

১৩০১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ সোমবার (ইংরেজী ১৮৯৪ সাল) রাত্রি ১টার সময়ে বহুমূত্ররোগে ভূদেববাবু পরলোক গমন করেন।

ভূদেববাবুর মৃত্যুতে বঙ্গদেশের যে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।



স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র দত্ত

রমেশচন্দ্র দত্ত

রমেশচন্দ্র দত্ত বিরাট্ পুরুষ। বিরাট্ তাঁহার কর্ম্ম, বিরাট্ তাঁহার অধ্যবসায়, বিরাট্ তাঁহার সাহিত্যসাধনা, বিরাট তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা, বিরাট্ তাঁহার মনস্বিতা, বিরাট্ তাঁহার স্বদেশপ্রেম। তাঁহার সমগ্র জীবন—কর্ম্মময় জীবন। রমেশচন্দ্র দত্ত, স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারীলাল গুপ্ত এই তিনজন সিবিলিয়ান হইবার জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। তিনজনেই সিবিলিয়ান হইয়া ফিরিয়াছিলেন। কিন্তু সিবিলিয়ান হইয়াও রমেশচন্দ্র মাতৃভূমিকে ভুলিয়া যান নাই। স্যর সুরেন্দ্রনাথ দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র রাজকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও স্বদেশের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী থাকিতেন। কেবল তাহাই নহে,—বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি তাঁহার প্রতিভার ও সাধনার গৌরবজনক পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

বংশ-কথা

যে বংশে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন তাহা রামবাগানের দত্ত-বংশ নামে প্রসিদ্ধ। এই বংশ বিদ্যানুশীলন ও পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এই বংশের নীলমণি দত্ত মহাশয় অতীব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদিম নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আজাপুর গ্রাম; মেমারি রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে দেড় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ঠিক কোন্ সময়ে এই দত্ত-বংশ কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে যুক্তিযুক্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, নীলমণি দত্ত মহাশয়ের পিতাই কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন।

এই নীলমণি দত্ত সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত স্বয়ং এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধকালে যখন ক্লাইব ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস পর পর বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন সেই সময়ে কলিকাতার অধিবাসিগণের মধ্যে নীলমণি দত্তের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। লোকের নিকট তিনি নীলু দত্ত নামেই অধিকতর পরিচিত ছিলেন। এই নীলু দত্তের কনিষ্ঠ পুত্রই আমার স্বর্গগত পিতামহ ৺পীতাম্বর দত্ত। আমি তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি যে, নীলমণি দত্তের বাটী সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। অতিথিসৎকারপুণ্যে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া পরে বহু ভদ্রলোক তাঁহার বাড়ীতে সমবেত হইতেন। ইঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। তখনকার কালে কলিকাতা সহরে যাঁহাদের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল এমন সকল ব্যক্তি—প্রত্যেকই তাঁহার বন্ধু ছিলেন। শোভাবাজার-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ নবকৃষ্ণ তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং মহারাজ নন্দকুমার স্বয়ং তাঁহার বাটীতে আসিতেন। নীলমণি দত্ত মহাশয় অতীব উদারপ্রকৃতি ছিলেন। এইজন্য স্বজাতীয় সমাজে যেমন তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল, তদানীন্তন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ সমাজেও তেমনি তাঁহার সম্মান ও সমাদর ছিল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণও তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন। তৎকালে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। এইজন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ একবার প্রসিদ্ধ পাদরী কেরি সাহেবকে বিতাড়িত করিয়া দেন। কেরি সাহেব তখন এই নীলু দত্তের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন ; এই ঋণ তিনি পরিশোধ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ইঁহার পুত্র স্বর্গীয় রসময় দত্ত মহাশয় বড়ই হিসাবী ও বিষয়বুদ্ধি-

সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পিতৃঋণ পরিশোধ করেন এবং নিজেও বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী ও যশস্বী হইয়া তদানীন্তন সমাজের অন্যতম অগ্রণীরূপে পরিণত হন। তৎকালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা-বিস্তারাদি নানাবিধ দেশহিতকর ব্যাপারে এদেশীয় সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিগণের সহকারিতা-লাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এই সহকারিত্ব-সূত্রেই রসময় দত্তের কর্ম্মকুশলতা ও গুণাবলী গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি প্রথমে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারীর পদে এবং পরিশেষে কলিকাতা ছোট আদালতের বিচারক-পদে নিযুক্ত হন। তখন এই পদ দেশীয়গণের পক্ষে দায়িত্বে ও মর্য্যাদায় সর্ব্বোচ্চ বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে এদেশের প্রায় সকল সাধারণহিতকর অনুষ্ঠানের সহিতই তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

রসময় দত্ত মহাশয় বহু ইংরেজী গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় পুস্তকাগারে রাখিয়াছিলেন এবং স্বীয় সন্তানগণের হৃদয়ে ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাহারই ফল—এই বংশের বংশধর-গণের সাহিত্যানুরাগিতা। নীলমণি দত্ত মহাশয় যেরূপ আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন এবং প্রত্যেক পর্ব্ব-পার্ব্বণে যেরূপ অপরিমিত অর্থব্যয় করিতেন, রসময় দত্ত মহাশয় সেইরূপ করিতেন না। এইজন্য ব্রাহ্মণ ও গোঁড়া হিন্দুগণের মধ্যে তাঁহার বড় সুনাম ছিল না। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতে এবং ইংরেজ শাসনের ফলে হিন্দু সমাজে যে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে রসময় দত্তের জীবনে তাহার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল।

রসময়ের সুশিক্ষিত পুত্রগণের মধ্যে গোবিন্দচন্দ্রই সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি ভারত সরকারের সুমার-বিভাগের একটী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই এই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ এবং

অবসরকাল নিভৃতে সাহিত্য ও ধর্ম্মানুশীলনে নিয়োজিত করেন। গোবিন্দচন্দ্র তরুণ বয়সে একখানি ইংরেজী কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বিলাতের 'ব্লাকউডস্ ম্যাগাজিন' নামক সাময়িক পত্রে উহা প্রশংসিত হইয়াছিল। এই নিভৃতবাসের সময়ে তিনি তাঁহার স্ত্রী, কন্যা, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পত্নী ও কন্যাদ্বয় সহ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তথায় তিনি তাঁহার পরিপক্ক বয়সের রচিত কবিতাবলী ও তৎসহ তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ও ভ্রাতুষ্পুত্র-প্রণীত কবিতাসমূহ 'ডট্ ফ্যামিলি এলবাম্' নাম দিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। গোবিন্দচন্দ্রের দুই কন্যা—জ্যেষ্ঠা অরু ও কনিষ্ঠা তরু। তরু ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অরু ও তরু উভয়ে অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহার কয়েক বর্ষ পরে গোবিন্দচন্দ্রও পরলোক গমন করেন।

রমেশচন্দ্রের পিতা ঈশানচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ জন্ম গ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে ইনি শিক্ষা লাভ করেন। ইনি এই কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক রিচার্ডসনের ছাত্র ছিলেন। ইনি হিন্দুকলেজে পঠদ্দশায় যেসমস্ত কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ঐগুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ঐসকল রচনায় তাঁহার সাহিত্যানুরাগিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশানচন্দ্র ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু-কলেজত্যাগ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হন এবং চারিবৎসর তথায় অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষায় স্বর্ণপদকসহ সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৮৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে ওলাউঠা রোগের প্রবল প্রকোপ হয়। সেই সময়ে ঈশানচন্দ্র ও আরও কতিপয় উন্নতমনাঃ যুবক বহু নিরাশ্রয় রোগীর সেবা-শুশ্রূষাদি করিয়া পরার্থপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ঈশানচন্দ্রের বয়স যখন ২১ বৎসর সেই সময়ে ৺রামরতন বসুর কন্যা শ্রীমতী ঠাকুরমণির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি পতির মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এই অকালমৃত দত্ত-দম্পতী চারিটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া যান। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ যোগেশচন্দ্র ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, রমেশচন্দ্র ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এবং অবিনাশচন্দ্র ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

ঈশানচন্দ্রের ভাগ্যে ডাক্তার হওয়া হয় নাই। তিনি তাঁহার পিতৃব্যপুত্র ডেপুটী কলেক্টর কৈলাসচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহায়তায় ডেপুটী কলেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্য্য তিনি অধিক দিন করিতে পারেন নাই। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই মে মাত্র তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে সরকারী কার্য্য-উপলক্ষে মফস্বল পরিদর্শন করিয়া নৌকাযোগে ফিরিয়া আসিবার সময় সন্ধ্যাকালে তিনি কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী চামরুল খালে সহসা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

রমেশচন্দ্রের পিতামহ পীতাম্বর দত্ত মহাশয় পুত্রশোকে মর্ম্মাহত হইয়া অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই; ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রেল তারিখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

রমেশ-পিতৃব্য রায় শশিচন্দ্র দত্ত বাহাদুরের পরিচয়ও এখানে দেওয়া উচিত। কারণ, রমেশচন্দ্র বলিতেন, উঁহারই চরিত্রের উজ্জ্বল আদর্শে আমার চরিত্র গঠিত হইয়াছে। শশিচন্দ্র প্রাচীন হিন্দুকলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এই কলেজের যেসকল ছাত্র ইংরেজী সাহিত্যে অসাধারণ অধিকারসম্পন্ন হইয়াছিলেন ইনিও তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইনি আজীবন জ্ঞানানুশীলন করিয়াছিলেন। ইনি ইংরেজী ভাষায় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন:—

(১) "The Ancient World"; (২) "Modern World";

(৩) "Bengal" (৪) "Reminiscences of a Kerani's Life" (৪) সিপাহী বিদ্রোহ-ঘটিত উপন্যাস "Sankar"। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচিত কতকগুলি ইংরেজী কবিতাও আছে। তখনকার কালে তাঁহার এইসকল রচনার উচ্চ প্রশংসা হইয়াছিল। শশিচন্দ্র বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের দপ্তরখানার প্রধান সহকারী ছিলেন। তদানীন্তন ছোটলাটগণ তাঁহার কার্য্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। স্যর উইলিয়াম গ্রে গবর্মেণ্টের নিকট তুইজন দেশীয়কে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন এবং শশিচন্দ্রকে অন্যতর যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া সুপারিশও করিয়া যান। কিন্তু ছোটলাট স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেলের আমলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর গবর্মেণ্ট তাঁহার কৃতিত্বের বিষয় স্বীকার করিয়া তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর শশিচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

পিতার মৃত্যুর পর রমেশচন্দ্র ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গের লালনপালন ও শিক্ষার ভার তাঁহাদের পিতৃব্য শশিচন্দ্রের উপরে পতিত হয়। তদনুসারে তিনি রমেশচন্দ্রদের বাটীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহারই নিকট হইতে রমেশচন্দ্র তুইটী বিষয় লাভ করেন; প্রথম—স্বাবলম্বন, দ্বিতীয়—সাহিত্য-সম্বন্ধীয় যশোলিপ্সা।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রমেশচন্দ্র হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। সে বারে ঐ স্কুল হইতে যত ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ হইয়া ১৪৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সিমুলিয়া-নিবাসী নবগোপাল বসু মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী মাতঙ্গিনী ওরফে মোহিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

অতঃপর রমেশ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন এবং দুই বৎসর পরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে এফ-এ পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার ও মাসিক ৩২৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন।

শৈশব ও কৈশোর

রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই আগষ্ট কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন ; সেই জন্য তাঁহাকে বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বদলী হইতে হইত। সুতরাং রমেশচন্দ্র বাঙ্গালা দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে শৈশব অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে রেল ছিল না ; সুতরাং দীর্ঘপথ নৌকা ও গো-যানে অতিক্রম করিতে হইত। বালক রমেশচন্দ্র চিরজীবন পল্লীভ্রমণের এই সুখময় স্মৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালের একটা ছবিও তাঁহার মনের মধ্যে ছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যখন তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ড্যালহৌসি বিলাত যাত্রা করেন এবং লর্ড ক্যানিং কলিকাতায় আগমন করিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন, সেই সময়ে রমেশচন্দ্র কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা যতদিন ভারতের রাজধানী ছিল ততদিন বড়লাটের আগমন ও বিদায়-গ্রহণ-ব্যাপার কলিকাতাতেই সংঘটিত হইত। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র সর্ব্বত্র পঠিত হইয়াছিল সেই সময়ে রমেশচন্দ্রের পিতা পাবনায় ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। যেদিন পাবনা সদরে বিপুল জনমণ্ডলীর সমক্ষে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় এই ঘোষণাপত্র পঠিত হয় সেইদিন রমেশচন্দ্র তথায় উপস্থিত ছিলেন।

বিলাত-যাত্রা

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ প্রাতঃকালে তিনজন বাঙ্গালী যুবক

বিলাত যাত্রা করেন। ইঁহাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিলাত যাইবার জন্য পিতৃ-অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট দুইজন বিহারিলাল গুপ্ত ও রমেশচন্দ্র দত্ত রাত্রিতে গোপনে বাটী হইতে পলায়ন করিয়া জাহাজ উঠিয়াছিলেন। বিলাত যাইবার ব্যবস্থা ইঁহারা ইঁহাদের অভিভাবকগণকে না জানাইয়া নিজেরা গোপনে গোপনেই করিয়াছিলেন। কারণ, তখনকার কালে বিলাত যাওয়া সহজ ছিল না। তখন বিলাত যাত্রা করিলে সমাজচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী ছিল। তখন হিন্দুর পক্ষে বিলাত-যাত্রা কিরূপ বিপত্তিজনক ছিল, তাহা আজিকার দিনে অনুমানেই বুঝিতে পারা যায়। জাহাজে যে তিনখানি টিকিট খরিদ করা হইয়াছিল সেগুলি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামেই খরিদ করা হইয়াছিল। "সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার দুইজন বন্ধুর জন্য"—এই পরিচয়েই তাঁহারা টিকিট কিনিয়াছিলেন। এই তিন যুবকের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের নাম ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতার পরিচিত। সুরেন্দ্রনাথ দেশসেবাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। রমেশচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের এই পবিত্র ব্রতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত আর নাই। রমেশচন্দ্র যখন বিলাত গমন করেন তখন তিনি বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। বিহারিলাল গুপ্তও প্রসিদ্ধ সিবিলিয়ান ছিলেন। ইনি কলিকাতা হাই-কোর্টের জজ হইয়াছিলেন এবং জজিয়তি করিতে করিতেই অবসর গ্রহণ করেন। রমেশচন্দ্র বিভাগীয় কমিশনার পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও কায়েমীরূপে নহে। তাঁহার মত যোগ্য ব্যক্তিকেও তখনকার কালে এই পদটীও পাকা বা কায়েমীভাবে দেওয়া হয় নাই। রাজকার্য্যেও তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কেবল রাজকার্য্যে কেন, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁহার যোগ্যতা পরিস্ফুট হইয়াছিল।

সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা

ইংলণ্ডে অধ্যয়ন ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র স্বয়ং লিখিয়াছিলেন ঃ—"এক ব:সর দারুণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত পড়াশুনা করিয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য, এই এক বৎসরকাল যেরূপ অবিরাম কঠিন পরিশ্রম করিয়াছি পূর্ব্বে এরূপ আর কখনও করি নাই। আমরা লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজে নিয়মিত উপস্থিত হইয়া অধ্যয়ন করিতাম। তদ্ব্যতীত অন্য সময়েও ঐ কলেজেরই কোন কোন অধ্যাপকের নিকটে গিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতাম। তাঁহারা আমাদের যথার্থ হিতৈষী মিত্রের ন্যায় অকৃত্রিম স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিতেন। দুইজন অধ্যাপকের নিকট আমরা বিশেষভাবে ঋণী। একজনের নাম—হেনরী মর্লি, অপর জনের নাম ডক্টর থিওডোর গোল্ডষ্টুকার। প্রথমোক্ত মহাশয় আমাদের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ইঁহার বাটীতে গিয়াও আমরা পাঠ লইতাম। তাঁহার বাসগৃহ যেন আমাদেরই বাসগৃহ বলিয়া মনে হইত। শেষোক্ত মহাশয় জর্ম্মানদেশীয় মহাপণ্ডিত; আমরা তাঁহার নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতাম।

"আমরা কলেজের অধ্যাপনাগৃহ অথবা পুস্তকাগারে প্রায় সারাদিন অতিবাহিত করিয়া সায়ংকালে বাসায় ফিরিতাম এবং ভোজনান্তে একবার ভ্রমণে বাহির হইতাম। ফিরিয়া আসিয়া একটু চা পান করিয়া পড়িতে বসিতাম এবং যতক্ষণ সাধ্য পাঠাভ্যাসে নিরত থাকিতাম। প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া সত্বর স্নান ও প্রাতঃ-ভোজন সমাধা করিয়া কলেজে যাইতাম।

"এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। পরীক্ষার সময় উপস্থিত। পরীক্ষার্থী ইংরেজ ছাত্রের সংখ্যা তিন শতের অধিক। ঐ সংখ্যার

মধ্যে মাত্র প্রথম ৫০ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে। এ অবস্থায় আমাদের ভাগ্যে যে কিরূপ ঘটিবে তাহা তখন অনুমান করা অসাধ্য। ঐ সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনেকে আমাদের ন্যায় লণ্ডন, অক্সফোর্ড অথবা কেম্ব্রিজে রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছেন, আবার অনেকে রেন সাহেবের নিকট কেবল এই পরীক্ষা দিবার জন্য বিশিষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। অবশিষ্ট ছাত্রগণ অপরাপর কলেজ হইতে নিজ নিজ বিশিষ্ট শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

"শিক্ষা-বিভাগে এরূপ কঠিন পরীক্ষা পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এই পরীক্ষা প্রায় এক মাসেরও অধিক কাল ব্যাপিয়া চলিল। পরীক্ষার বিষয় বহু কিন্তু ছাত্রেরা সমস্ত বিষয়েরই পরীক্ষা দিতে বাধ্য নহে। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকেই তাহার মনোমত কয়েকটী বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। আমি পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত পাঁচটী বিষয় মনোনীত করিয়াছিলাম:—(১) ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস ও রচনা (২) গণিত (৩) মনোবিজ্ঞান (৪) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং (৫) সংস্কৃত।

"পরীক্ষা-ফল যখন বাহির হইল তখন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ইংরেজীর পরীক্ষায় ৩২৫ জন ছাত্রের মধ্যে আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছি এবং ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪২০ নম্বর পাইয়াছি। সংস্কৃতে ৫০০ শতের মধ্যে ৪৩০ নম্বর পাইয়াছিলাম। সমস্ত পরীক্ষার ফল বাহির হইতে প্রায় এক মাসের অধিক কাল কাটিয়া গেল। এই সময়টা বড়ই উদ্বেগের সহিত কাটাইলাম, পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখিলাম—আমি উত্তীর্ণ ৫০ জনের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছি। আমার বন্ধুদ্বয়ও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।"

ইংলণ্ডে অধ্যয়নের সময়ে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে পার্লামেণ্টের সদস্য-নির্ব্বাচন-ব্যাপার ও বিরাট ভোট-যুদ্ধ রমেশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে

লিবারেল দল জয়লাভ করেন এবং সেইবার প্রথম গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। রমেশচন্দ্র কমন্স মহাসভায় উপস্থিত হইতেন; গ্লাডষ্টোন ও ডিসরেলীর বক্তৃতা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিতেন এবং ভারতবন্ধু জন ব্রাইট ও হেনরী ফকেটের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সভায় তিনি জন ষ্টুয়ার্ট মিলের বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। চার্লস ডিকেন্সকে তাঁহার উপন্যাস হইতে আবৃত্তি করিতে তিনি শুনিয়াছিলেন। ভারতের তদানীন্তন ষ্টেট সেক্রেটারী বা ভারত-সচিব ডিউক অফ আরগাইল ইণ্ডিয়া অফিসে যেসকল সম্বর্দ্ধনা-সভার অনুষ্ঠান করিতেন, রমেশচন্দ্র সেগুলিতে উপস্থিত থাকিতেন। তখনকার কালের বহু খ্যাতনামা ইংরেজের সহিত রমেশচন্দ্রের পরিচয় হইয়াছিল।

পরীক্ষা দিয়া তিনি স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে রমেশচন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয় স্বদেশযাত্রা করেন। এই উপলক্ষে তাঁহারা ফ্রান্স, জর্ম্মণী, সুইজারল্যাণ্ড ও ইটালী পরিদর্শন করেন। ফ্রান্সে তাঁহারা বিপদে পড়িয়াছিলেন। তখন ১৮৭০—৭১ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ সবে মাত্র শেষ হইয়াছে। এই অবস্থায় ইঁহারা তিন জন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে উপস্থিত হন। কমিউনিষ্টগণ প্যারিসের অধিকাংশ সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নষ্ট করিয়াছিল। সেইজন্য ফরাসী গবর্মেণ্ট তাহাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই তিন জন যুবক ভার্সেলেস পরিদর্শনের সময়ে কমিউনিষ্ট-সন্দেহে ধৃত হন এবং এক রাত্রি ফরাসীদের গারদে অতিবাহিত করেন। পরদিন তাঁহাদিগকে পরীক্ষার জন্য বাহিরে আনা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের পাশপোর্ট দেখাইলেন এবং সদর্পে বলিলেন,—আমরা ব্রিটীশ প্রজা। এই সময়ে ফরাসী অফিসারদিগের ক্রোধের উগ্রতা প্রশমিত হইয়াছিল। তাঁহারা যুবকত্রয়ের কথা মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা

যুবকদিগের কথা বিশ্বাস না করিয়া পারিলেন না। তখন যুবকেরা নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। যদি দুই চারি সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহারা গ্রেপ্তার হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া নিশ্চয়ই মারা হইত; কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ। স্বদেশে যাঁহাদের কর্ত্তব্য নিহিত, বিদেশে তাঁহাদের প্রাণ যাইবে কেন?

রাজকর্ম্মে নিয়োগ

১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই এগার বৎসর কাল তিনি বাঙ্গালার নানা জেলায় কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলায় দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত নরনারীর দুর্দ্দশা-মোচনের কার্য্যে তাঁহার প্রথম হাতে খড়ি হয়। কিন্তু ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইহা অপেক্ষাও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে তিনি নিযুক্ত হন। সেই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ভীষণ ঝড় হয় ও সমুদ্রতরঙ্গ নদীগর্ভে প্রবেশ করে। ফলে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হয়। গঙ্গার মোহানায় দক্ষিণ সাহবাজপুর চরে রমেশচন্দ্র প্রেরিত হন। এই চরের তটদেশের সর্ব্বত্র তখন মৃতদেহ ভাসিতেছে। কেবল কি তাহাই?—বৃক্ষে নরনারীর মৃতদেহ ঝুলিতেছে; পুষ্করিণীর জলে মনুষ্যের শব ভাসিতেছে। নদীর জলে স্রোতের মুখে মানুষ ও পশুর মৃতদেহগুলি ইতস্ততঃ ভাসমান হইতেছে। ভীষণ ওলাউঠার প্রকোপে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। মানুষের ধনসম্পত্তি রক্ষকহীন অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া লুট-তরাজ অবাধে চলিতেছে। তাহার উপর শস্যনাশ হেতু ভীষণ দুর্ভিক্ষেরও আবির্ভাব হইয়াছে। এইসকল ভীষণ বিপত্তির মধ্যে মাত্র পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া তরুণ সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র তথাকার শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি নূতন করিয়া আবার গ্রাম নির্ম্মাণ করেন, সর্ব্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন, বিপন্ন প্রজাগণকে সাহায্য দান করেন। তিনি যখন এই স্থান হইতে

বদলি হইয়া অন্যত্র চলিয়া যান, তখন সেখানকার অধিবাসিগণ সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করিতেছিল।

প্রথম গ্রন্থ-রচনা

বিভিন্ন জেলায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও রমেশচন্দ্রের লেখনী সাহিত্য-রচনায় বিমুখ ছিল না। তিনি প্রথমে ইংরেজীতে "Three Years in Europe" (ইউরোপে তিন বৎসর) নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করেন। তৎপরে তিনি বঙ্গসাহিত্য ও বাঙ্গালার কৃষক সম্বন্ধেও ইংরেজীতে পুস্তক প্রণয়ন করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের পিতৃবন্ধু। এইজন্য রমেশচন্দ্র সুবিধা পাইলেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। একদিন কলিকাতায় রমেশচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়ে রমেশচন্দ্রকে বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা করিতে বলেন। রমেশচন্দ্র বলেন,—আমি বাঙ্গলা লিখিবার পদ্ধতি জানি না, বাঙ্গালায় বই লিখিব কেমন করিয়া ?

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন—আপনার মত শিক্ষিত লোকে যাহা লিখিবে তাহাই বাঙ্গলা রচনার পদ্ধতি বা ভঙ্গী হইবে। আপনার যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে ভাষা বা রচনার পদ্ধতি আপনিই আসিবে।

রমেশচন্দ্র এই কথোপকথনের বিষয় বিস্মৃত হন নাই। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি চারিখানি বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। সে চারিখানির নাম—'বঙ্গবিজেতা', মাধবীকঙ্কন', 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' এবং 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত'। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে 'সংসার' ও ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাজ' নামক

তাঁহার দুইখানি সামাজিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকগুলি বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে প্রভূত প্রতিপত্তি ও সমাদর অর্জ্জন করে। তিনি 'The Slave Girl of Agra' নামে 'মাধবীকঙ্কনে'র ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে সুধীসমাজে প্রশংসিত হইয়াছিল।

জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট

এগার বৎসর হইল, রমেশচন্দ্র রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি দুইবার অস্থায়ীভাবে কিছুদিনের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন। তখন ভারতবাসীকে গবর্মেণ্ট সাহস করিয়া জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে পাকাভাবে নিযুক্ত করিতে পারিতেন না;—কি জানি পাছে তাহাদের যোগাতায় কুলাইয়া না উঠে। বহু ইংরেজ রাজপুরুষের মনেও এইরূপ সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। ইংরেজ সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা ত এই বিষয়টি হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন। যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে এই বিষয়ের পরীক্ষা হইয়া গেল। গবর্মেণ্ট রমেশচন্দ্রকে দীর্ঘকাল একটি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট-পদে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া ভারতবাসীর যোগ্যতা পরীক্ষা করিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দুই বৎসর কাল তিনি বাখরগঞ্জ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। বাখরগঞ্জ জেলায় উপদ্রব গণ্ডগোল লাগিয়াই আছে। এই জেলার শাসনকার্য্য দুষ্কর বলিয়া রাজপুরুষগণের ধারণা। বিশেষতঃ সেই সময়ে ইলবার্ট বিলের আন্দোলন চলিতেছে। কালায় ও ধলায় বিরোধের ভাব খুবই তখন প্রবল। সেই সময়ে দেশীয় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ইংরেজ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, সিবিল সার্জ্জন, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত বিনা গোলোযোগে একত্র মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।

বাখরগঞ্জে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগিয়াই ছিল। তিনি দৃঢ়হস্তে সেসকল দমন করিয়া জেলাকে অনেকটা ঠাণ্ডা করিয়া রাখেন। জেলার অধিবাসীরা তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিত; প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ও সরকারী গেজেট রমেশচন্দ্রের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে কর্ত্তব্য-পালনের ও যোগ্যতার প্রভূত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

লর্ড রিপণ ও রমেশচন্দ্র

লর্ড রিপণ তখন ভারতের রাজপ্রতিনিধি। তিনি রমেশচন্দ্রের যোগ্যতা ও গুণপণার বিষয় অবগত হইয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি রমেশচন্দ্রকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করেন। বাখরগঞ্জের মত বিভ্রাটপূর্ণ জেলা যে, তিনি যোগ্যতার সহিত শাসন করিয়াছেন—সেজন্য তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসাবাদ করেন। লর্ড রিপণ আরও বলেন,—আমার আপনাকে আহ্বান করিবার উদ্দেশ্য,—আপনার দর্শন লাভ করা এবং ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে আপনার সহিত পরিচিত হওয়া। আপনার কার্য্যদক্ষতার বিষয় ইংলণ্ডে প্রচার করা উচিত। তাহা হইলে উচ্চ-পদে ভারতবাসীর নিয়োগ সম্বন্ধে আর যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথা উত্থাপিত হইবে না। সুখের বিষয় এই যে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতীয় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনও প্রকার সংশয়ের কথা উঠে নাই।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন

রমেশচন্দ্র রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার পর হইতেই বাঙ্গালার রায়তগণের দুর্দ্দশার বিষয় অবগত ছিলেন। বাল্যকালেও তিনি বাঙ্গালার অনেক জেলায় তাঁহার পিতার সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে রায়তদের অসুবিধার বিষয় তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জমীদারেরা তখন ইচ্ছামত রায়তদের খাজনা বৃদ্ধি করিতেন এবং জমি হইতে উৎখাতও করিতে পারিতেন। সকল জমীদারই যে এইরূপ অত্যাচার রায়তদের উপর করিতেন তাহা নহে; তবে কেহ কেহ করিতেন। রমেশচন্দ্র তাঁহাদের নির্য্যাতন হইতে বাঙ্গালার রায়তদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য উহাদের কষ্টকর অবস্থা সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। উহা প্রকাশিত হইবার পর প্রথমে জমীদার ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু রমেশচন্দ্র নিরুৎসাহ হইবার পাত্র নহেন। তিনি ধীরভাবে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন ও মধ্যে মধ্যে সেসকল বিষয়ে লিখিতেও থাকিলেন। কিছুদিন পরেই গবর্মেণ্ট প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিলেন। বাঙ্গালার তদানীন্তন রাজস্ব বিভাগীয় সেক্রেটারী স্যর এণ্টনী ম্যাকডোনেল অবশেষে এই সম্বন্ধে এক আইনের খসড়া-রচনায় ব্রতী হইলেন। তিনি যুবক রমেশচন্দ্রের নিকট হইতে যে সমস্ত তথ্য প্রাপ্ত হইতেন সেই-গুলি হইতে তাঁহার প্রভূত সাহায্য ও উপকার হইত। তিনি এই বিষয় সরকারী গেজেটে উল্লেখ করিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, রমেশচন্দ্রের নিকট হইতে আমি এ সম্বন্ধে যে মূল্যবান উপকরণ লাভ করিয়াছি, এরূপ মূল্যবান উপকরণ বা সাহায্য আর কাহারও নিকট হইতে পাই নাই। অবশেষে এই আইনের খসড়াই বড়লাট লর্ড ডাফরিণের সময়ে আইনে পরিণত হয়। ইহাতে বাঙ্গালার রায়তেরা যে সাহায্য চাহিতেছিল তাহা তাহারা লাভ করে। ইহারই নাম—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন। অসহায় দরিদ্র অজ্ঞ বাঙ্গালার কৃষক ও রায়তদিগের কল্যাণের জন্য রমেশচন্দ্র দত্তের এই প্রয়াস চিরকাল ইতিহাসে সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

ঋগ্‌বেদ-অনুবাদ

চৌদ্দ বৎসর রাজকার্য্য করিবার পর রমেশচন্দ্র ১৮৮৫ হইতে ১৮৮৭ এই দুই বৎসরের জন্য অবকাশ গ্রহণ করেন। প্রথম বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ তিনি ভারতেই অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি সাহিত্য-সাধনায় একাগ্রচিত্তে আত্মনিয়োগ করেন এবং 'সংসার' নামক সামাজিক উপন্যাস এই অবসরে রচিত হয়। পরে ইহার ইংরেজী অনুবাদও হয়—ইংরেজীতে উহার নাম হয়—The Lake of Palms। অতঃপর রমেশচন্দ্র কতিপয় পণ্ডিতের সাহায্যে ঋগ্‌বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ আরম্ভ করেন। রমেশচন্দ্র অ-ব্রাহ্মণ; বিশেষতঃ বিলাত-ফেরত। তাহার উপর তিনি বেদের অনুবাদ করিতেছেন, এই জন্য গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় তাঁহাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তিনি সেদিকে মনোনিবেশ না করিয়া অক্লান্তভাবে আপনার আরব্ধ কার্য্য-উদ্‌যাপনে ব্রতী হইলেন। বিদ্যাসাগরমহাশয় বিধবা-বিবাহ-আন্দোলন আরম্ভ করিবার সময়ে যেরূপ অতি ঘোর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, রমেশচন্দ্রের ঋগ্‌বেদ অনুবাদের সময়েও সেইরূপ উৎকট চাঞ্চল্যের সঞ্চার ঘটিয়াছিল। তিনি কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত অনুবাদকার্য্য করিয়া যাইতে লাগিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঋগ্‌বেদের অনুবাদ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রমেশচন্দ্র বিলাত যাত্রা করেন। সেই সময়ে সমগ্র ঋগ্‌বেদের অনুবাদকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া ছাপাখানায় প্রেরিত হইয়াছিল।

সন্তান-সন্ততি

রমেশচন্দ্রের ছয়টী সন্তান—পাঁচটী কন্যা ও একটী মাত্র পুত্র। জ্যেষ্ঠা কমলার জন্ম ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে। ইহার স্বামীর নাম

শ্রীযুত প্রমথনাথ বসু। ভারত গবর্মেণ্টের ভূতত্ত্ব-বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার বিবাহ হইয়াছিল।

দ্বিতীয়া কন্যা বিমলা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যার জন্ম রমেশচন্দ্রের বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বেই হইয়াছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আসামের এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুত বলিনারায়ণ বড়ুয়ার সহিত শ্রীমতী বিমলার বিবাহ হয়।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয়া কন্যা অমলার জন্ম হয়। পাটনা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুত ক্ষীরোদবিহারী দত্ত ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে বিবাহ করেন। সাধারণের নিকট ক্ষীরোদবিহারী Mr. K. B. Dutt নামে পরিচিত।

চতুর্থী কন্যা সরলা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার স্বামী প্রসিদ্ধ সিবিলিয়ান মিঃ জে-এন গুপ্ত। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ইহাদের বিবাহ হয়।

অতপর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র অজয়ের জন্ম হয়। তিনি এক্ষণে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কনিষ্ঠা কন্যা সুশীলা জন্মগ্রহণ করেন

দ্বিতীয়বার বিলাত-যাত্রা

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রমেশচন্দ্র সস্ত্রীক ও সসন্তান বিলাত যাত্রা করেন। এই সময়ে তাঁহার অগ্রজ যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও তাঁহার সহযাত্রী হন। যোগেশচন্দ্রও ইংরেজিতে কৃতবিদ্য ছিলেন। সাহিত্য-প্রতিভা তাঁহারও যথেষ্ট ছিল। ইংরেজী কবিতা-রচনায় তিনি সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। তিনি কাশ্মীর রাজবংশের ইতিহাস—রাজতরঙ্গিণীর ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। যোগেশচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচন্দ্র সিবিলিয়ান। মাদ্রাজ তাঁহার কর্ম্মস্থান। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার বন্ধু

বিহারিলাল গুপ্ত মহাশয় বিলাতে গিয়াছিলেন। তিনি লণ্ডনে আসিয়া সপরিবার রমেশচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেন। রমেশচন্দ্র ও বিহারিলালের বন্ধুত্বের তুলনা নাই। ইঁহারা দুইজনে স্কুলে ও কলেজে একত্র পাঠ করিয়াছিলেন। ইঁহারা দুইজনে একসঙ্গে পলাইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন; ইঁহারা দুইজনে একযোগে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়াছিলেন। দুইজনেই সরকারী কার্য্যে যশঃ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন—একজন শাসন-বিভাগে ও অপরজন বিচার-বিভাগে। বার্দ্ধক্যে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রায় একত্র অবস্থান করিয়াছিলেন।

এই সময়ে রমেশচন্দ্র ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। তিনি প্রথমে নরওয়ে ও সুইডেন পরিদর্শন করিয়া নর্থ কেপে গমন করেন। অতঃপর তিনি ফ্রান্স, জর্ম্মণী, অষ্ট্রিয়া, ইটালী প্রভৃতি ইউরোপের মধ্য যুগের অন্যান্য দেশ পরিদর্শন করেন। রমেশচন্দ্র ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস বিশেষভাবেই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, অষ্ট্রীয়া ও জর্ম্মণীর যেসকল স্থান মধ্যযুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল সেই স্থানগুলি সবিশেষ মনোনিবেশ ও আগ্রহ-সহকারে দর্শন করেন। বার্লিনে আধুনিক জর্ম্মণ সাম্রাজ্যের গঠয়িতা বৃদ্ধ সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অতঃপর ইটালী ভ্রমণ শেষ করিয়া, ফ্রান্স হইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি সপরিবারে ইংলণ্ড হইতে ভারতে ফিরিয়া আসেন।

প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস।

দুই বৎসরের অবকাশের পর রমেশচন্দ্র কর্ম্মে যোগদান করেন। কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে অল্পদিনের জন্য পাবনার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দেন। অতঃপর তিনি ময়মনসিংহ জেলায় বদলি হন। ময়মনসিংহ একটী

সুবৃহৎ জেলা। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। পূর্ব্ববর্ত্তী একজন প্রবীণ ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যফলে এই জেলায় হিন্দু ও মুসলমান-দিগের মধ্যে অতি তীব্র মনোমালিন্যের সঞ্চার হইয়াছিল। রমেশ-চন্দ্রের আগমনের কয়েকমাস পরেই এই মনোমালিন্য তিরোহিত হইয়া যায়। প্রায় আড়াই বৎসর রমেশচন্দ্র এই জেলায় কর্ম্ম করেন। ইনি দৃঢ়হস্তে দুষ্টদিগকে সায়েস্তা করেন। অনেকগুলি রাস্তা তৈয়ারী করাইয়া অন্তর্বাণিজ্য ও লোকের গতায়াতের সুবিধা করিয়া দেন। জেলা বোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডগুলি তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে বহু জনহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অনেকে মনে করিতে পারেন—এত গুরুতর কার্য্য করিয়া অপর কোনও কার্য্য করিবার অবসর মানুষের থাকে না। কিন্তু রমেশচন্দ্র সাধারণ মানুষ নহেন—তিনি অতি-মানুষ। ঋগ্‌বেদের অনুবাদ করিবার সময়ে তাঁহার মনে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচনা করিবার আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্য ও ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর গবেষণা-সমূহ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহারই বেদীর উপর এই ইতিহাসের সৌধ তিনি রচনা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। একে এরূপ গুরু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য—তাহার উপর এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ! ময়মনসিংহে তেমন পাঠাগার নাই; কাজেই কলিকাতা হইতে রাশী-কৃত পুস্তক আনয়ন করা হইল। তিনি বর্ষার সময়ে যখন সফরে বাহির হইতেন তখন তাঁহার নৌকায় রাশি রাশি পুস্তক, পাণ্ডুলিপি, প্রুফ সিট যেন বোঝাই হইয়া থাকিত। দিনের বেলায় রাজকার্য্য—একটুও অবসর নাই; সেইজন্য রাত্রিতে আহারের পর তিনি ইতিহাস-রচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিতেন; কখন কখনও উষার আলোক পর্য্যন্ত ফুটিয়া উঠিত; তখন তিনি তাড়াতাড়ি কার্য্য ফেলিয়া নিদ্রা যাইতেন। স্বদেশের অতীত গৌরবকে

তিনি জগতের সমক্ষে দেখাইবার জন্য এই ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য এইরূপ গুরু পরিশ্রম স্বীকার করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। অবশেষে ১৮৮৮ হইতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার Civilization in Ancient India নামক বিরাট গ্রন্থ তিন খণ্ডে বাহির হয়। এই পুস্তকের একটী সংস্করণ কয়েক বৎসর পরে লণ্ডন সহরে প্রকাশিত হয়। তাহার পর ইহার আরও কয়েকটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

উপাধি লাভ।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র বদলি হইয়া বর্দ্ধমানে আসেন। সেই সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজা অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টরকে তাঁহার শিক্ষাকার্য্য ও সম্পত্তি পরিচালন-কার্য্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইত। বর্দ্ধমান হইতে তিনি দিনাজপুরে বদলি হন। সেখান হইতে তাঁহাকে মেদিনীপুর জেলায় বদলি করা হয়। তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল এখানকার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

রমেশচন্দ্র বাঙ্গালা দেশের কতিপয় বড় বড় জেলায় প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহার উপর তাঁহার সাহিত্য-সাধনাও গবর্ণমেণ্টের অবিদিত ছিল না। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সেইজন্য তাঁহাকে সি-আই-ই উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ময়মনসিংহ ও মেদিনীপুরে কঠোর পরিশ্রম করিয়া এবং বর্দ্ধমান ও দিনাজপুরের মত ম্যালেরিয়াপূর্ণ জেলায় অবস্থান করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। এইজন্য তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎ ঋতুতে পুনরায় দীর্ঘ অবকাশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

তৃতীয়বার ইংলণ্ড যাত্রা।

এই শরৎ ও শীতঋতুতে তিনি কাশ্মীর, মসৌরী ও হরিদ্বার এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার বন্ধু

বিহারী লাল গুপ্ত মহাশয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তথায় বসন্তকালে তাঁহার ম্যালেরিয়া রোগ আবার দেখা দেয় এবং তিনি সমুদ্রতীরবর্ত্তী বোর্ণ মাউথ নগরে তাঁহার বাটীর একটী গৃহে কয়েক সপ্তাহ শয্যাগত ছিলেন। রোগ শয্যায় শায়িত অবস্থাতেও তিনি আপনার পুস্তকগুলির পুনঃ সংস্করণের জন্য সংশোধনাদি করিতেন। এইজন্য তাঁহার গৃহকর্ত্রী তাঁহার ঘর হইতে সমস্ত পুস্তক ও কাগজপত্র সরাইয়া অন্যত্র রাখিয়াছিলেন। কতকটা সুস্থ হইয়া তিনি জর্ম্মনীতে গমন করেন এবং সেখানে যাইয়া খনিজ জলে স্নান ও খনিজ জল পান করিতে থাকেন। ইহাও এক প্রকার চিকিৎসা। এই সময়ে তিনি জর্ম্মণ ভাষা শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই কার্য্যে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি বরং ফরাসী ভাষা অনেকটা জানিতেন। ফরাসী ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থ তাঁহার একরূপ নিত্যসঙ্গী ছিল। রমেশচন্দ্রের ধারণা ছিল—ফরাসী ঐতিহাসিকগণ যে যুগের ইতিহাস লিখেন সেই যুগের প্রকৃতি যেন উন্মোচন করিয়া দেখাইয়া দেন। ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য রক্ষায় তাঁহারা চিন্তাশীলতা ও বিচারবুদ্ধির প্রভূত পরিচয় দিয়া থাকেন। এই দুই বিষয়ে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ।

বিভাগীয় কমিশনার।

বল এবং স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিয়া রমেশচন্দ্র ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনিই ইহার প্রথম সভাপতি-পদে বৃত হন। দত্ত মহাশয় প্রায় ২২ বৎসরকাল সরকারী কর্ম্ম করিয়াছেন। তাঁহার যোগ্যতা পূর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছে। শাসন ব্যাপারের জটিল সমস্যার সমাধানকল্পে রমেশচন্দ্রের পরামর্শ ও উপদেশ গবর্ণমেণ্ট মূল্যবান বলিয়া

বিবেচনা করেন। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে যখন রমেশচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের প্রভূত প্রশংসাভাজন হইয়াছেন, তখন কি তাঁহাকে বিভাগীয় কমিশনারের পদে নিযুক্ত করা হইবে? না, দেশীয় বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করা হইবে? ভারত সচিবের সভায়ও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। সেখান হইতে উত্তর হইল—ভারতীয় কর্ম্মচারী যোগ্য হইলে তাঁহার দাবী উপেক্ষিত হইবে না। তদনুসারে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রমেশচন্দ্র বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত করা হয়। জেলার কলেক্টররূপে বহুদিন তিনি কর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়া জেলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার প্রভূত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। এ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন ব্যবস্থাপক সভায় উঠিলে তিনি তাহার উত্তর দিতেন তদানীন্তন বাঙ্গালার লাট স্যার চার্লস ইলিয়ট একথা একাধিকবার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর তাঁহাকে উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার করা হয়। উড়িষ্যার কমিশনার উড়িষ্যার ২২টি করদ রাজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অর্থাৎ হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। এই পদ অনেকটা রাষ্ট্র-নৈতিক পদ। একজন ইংরাজ রাজপুরুষ এখানকার সরকারী প্রতিনিধি-স্বরূপ থাকিলেও গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এ পদের যোগ্য মনে করেন নাই; সেই জন্য রমেশচন্দ্রকে তাঁহার উপরওয়ালা করিয়াছিলেন।

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ।

বিভাগীয় কমিশনাররূপেও তিনি সুযশঃ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি পুনরায় ছুটী লয়েন। ঐ বৎসরেই অক্টোবর মাসে তিনি সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ২৬ বৎসর সরকারী কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সিবিল সার্ভিসের নিয়ম

অনুসারে তিনি আরও নয় বৎসর চাকুরী করিতে পারিতেন। তথাপি দত্ত মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলেন কেন? জনসাধারণে এই বিষয় লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহার অবসর গ্রহণের দুইটী কারণই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। প্রথম—তিনি মন প্রাণ ঢালিয়া সাহিত্যসাধনা করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন—বাণীর আরাধনাকেই আমি আমার জীবনের প্রধান করণীয় বলিয়া মনে করি। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল—আমি এমন কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া যাইব, যাহাতে আমার দেশবাশীর নিকট আমার নাম চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। দ্বিতীয়—তাঁহার দেশবাসীরা স্বায়ত্ত শাসন লাভের জন্য যে প্রচেষ্টা করিতেছেন তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি দীর্ঘ-কাল সরকারী কর্ম্ম করিয়া বুঝিয়াছিলেন যে. এদেশের লোককে দেশ শাসনের ভার বহুল পরিমানে না দিলে ইংরাজের ভারত শাসন পদ্ধতি সুফলপ্রদ হইবে না। তাই স্বায়ত্ত শাসন যাহাতে এদেশে সত্বর প্রবর্ত্তিত হয় সেই আন্দোলনে সাহায্য করিবার জন্য তিনি অত্যধিক ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দুই কারণই তাঁহার এত শীঘ্র অবসর গ্রহণের হেতু। তিনি যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর হইয়াছিল।

ইংলণ্ডে অবস্থান।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সাত বৎসর কাল রমেশচন্দ্র ইংলণ্ডে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি দুইবার ভারতে আসিয়াছিলেন। একবার ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতিরূপে, আর একবার ১৯০২ খৃষ্টাব্দে।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রমেশচন্দ্রের সহিত তাঁহার পত্নী ও কনিষ্ঠা কন্যা বিলাত গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র অজয় ইহার পূর্ব্ব বৎসরই বিলাতে গিয়াছিলেন। ইনি অক্সফোর্ডে ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। এইস্থান হইতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করেন। পরে ব্যারিষ্টার হইয়া স্বদেশে চলিয়া আসেন।

রমেশচন্দ্র স্বয়ং এই সময়ে লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে ভারত ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এস্থানে কয়েক বৎসর তিনি ভারত ইতিহাস সম্পর্কে বক্তৃতা করেন; বহু ইংরাজ ছাত্র ও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থী যুবক তাঁহার বক্তৃতাগুলি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন।

ভারত-শাসন-সংস্কার সম্পর্কে বিলাতে দাদা ভাই নওরজী ও উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় চেষ্টা করিতেন; রমেশচন্দ্র তথায় যাইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। তখন তিনজনে মিলিয়া ভারতের শাসন-নীতির সংস্কার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রমেশচন্দ্রের বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্য সম্বন্ধে আন্দোলন প্রবলভাবে আরম্ভ হয়। দত্ত মহাশয় এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করিয়াছিলেন। তাহারই ফল—এই আন্দোলন। ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন-প্রচেষ্টার ইতিহাসে এই তিনজন ভারতবাসীর নাম উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে রামায়ণ ও মহাভারত ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হয়। তিনি সঙ্কল্প করেন যে, সমগ্র গ্রন্থের অনুবাদ করিতে হইবে, সংক্ষিপ্ত আকারে গল্পাংশের অনুবাদ প্রকাশ করা হইবে না। কেবল তাহাই নহে,—অনুবাদ কবিতায় হইবে। এজন্য তিনি কয়েকরূপ ইংরাজী ছন্দ

দ্বারা অনুবাদের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহা মনোমত হইল না। পরিশেষে সংস্কৃত অনুষ্টুপ ছন্দের ন্যায় ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়া তাহারই দ্বারা এই দুই বিরাট গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন! অনুবাদকার্য্য যখন চলিতেছে তখন তিনি অধ্যাপক মোক্ষমূলরের উপদেশ চাহেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলর বলেন,—৯০ হাজার শ্লোক বিশিষ্ট মহাভারতরূপ বিরাট্ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু ইহাতে দত্ত মহাশয় নিরুৎসাহ হন নাই। তিনি ধীরে ধীরে অনুবাদ করিয়া যাইতে লাগিলেন। পরিশেষে মহাভারতের অনুবাদ শেষ হইয়া গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তিনি উহার একখণ্ড অধ্যাপক মোক্ষমূলরকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। উহা পাঠ করিয়া অধ্যাপক মহোদয় এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিতে সম্মত হন। এই ভূমিকা গ্রন্থের সহিত মুদ্রিত করা হয়। অতঃপর রামায়ণের অনুবাদও প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যেই মহাভারত ও রামায়ণের অনুবাদ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যথাক্রমে ১৫ হাজার ও ১০ হাজার খণ্ড বিক্রয় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ রমেশচন্দ্রের বিরাট কীর্ত্তি।

১৮৯৮ ও ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নানা স্থানে ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য রমেশচন্দ্র আহূত হইয়াছিলেন। এই দুই বৎসরের অধিকাংশ সময়েই তাঁহাকে এই কার্য্য করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ, তদুপরি সীমান্ত যুদ্ধ। রমেশচন্দ্র বক্তৃতাদ্বারা তখন ইংলণ্ডের জনসাধারণের মনে ভারত সম্বন্ধে আগ্রহ জাগাইয়া তুলেন। তাঁহার বক্তৃতায় প্রত্যক্ষ প্রমাণাবলী যেমন থাকিত, যুক্তিতর্কও তেমনই থাকিত। তাই ভারত-শাসন-সংস্কারের আশু প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে তিনি যে সকল বক্তৃতা

করিতেন, সেগুলি তাঁহার দেশবাসীগণের মর্ম্ম স্পর্শ করিত। সুতরাং শীঘ্রই তিনি ভারতবাসীর প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এই স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রীতির ফলস্বরূপ তাঁহাকে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সভাপতি-পদে বৃত করা হয়। দেশবাসীর হস্তে ইহাই সর্ব্বোচ্চ সম্মান। রমেশচন্দ্র এই সর্ব্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসের সভাপতিরূপে বলেন,—অত্যধিক রাজস্বই এদেশের কৃষককুলের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের কারণ। এজন্য জমীদারদিগেরও যে ক্ষতি না হইতেছে তাহা নহে।

লর্ড কর্জ্জনের সহিত তর্ক-বিতর্ক।

কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রমেশচন্দ্র তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কর্জ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি দীর্ঘকাল দত্ত মহাশয়ের বক্তব্য শ্রবণ করেন। প্রথমতঃ তিনি বলেন,—সরকারী রাজস্বের একটা সীমা বাঁধিয়া দেওয়া হউক। উহা যে ক্রমশঃ বাড়াইতেই হইবে এরূপ কোনও নয়ম থাকা উচিত নয়। এই সীমা বা গণ্ডীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জমি জরিপ করা উচিত এবং রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে হইলেও এই গণ্ডীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহা করা সঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বলেন,—বড়লাটের এবং প্রাদেশিক শাসকবর্গের শাসন-পরিষদের সদস্য-পদ ভারতবাসীকে প্রদান করা উচিত। এই ব্যাপার লইয়া অনেক তর্ক হয়। শেষে লর্ড কর্জ্জন বলেন,—এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক শাসনকার্য্য পরিচালনার যে পদ্ধতি আছে তাহাই কি ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে? লর্ড কর্জ্জন সাত বৎসর ভারত শাসন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু শাসন-ব্যাপারে যে এই একেশ্বর নীতি যথেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারেরই প্রশ্রয় দিয়াছিল, তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। লর্ড কর্জ্জন শাসন-কার্য্যে এই একেশ্বর নীতি

পরিচালিত করিতে যাইয়া লোকমতকে পদদলিত করিয়া বঙ্গবিভাগ করেন; তাঁহার এই যথেচ্ছাচারিতার ফলে দেশে যে অশান্তির তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার বেগ আজিও অনুভূত হইতেছে। জনমত-প্রধান বা জনমণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ববিশিষ্ট শাসন-পদ্ধতিই জগতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইলেও লর্ড কর্জ্জন তাহা ভারতের পক্ষে অনুপযোগী মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু গায়ের জোরে যুগ-প্রভাবের শক্তি অতিক্রম করা অসম্ভব। তাঁহার অবিবেচনার ফলে যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহারই ফলে কতকটা দেশবাসীর প্রতিনিধিত্ব-মূলক শাসন-পদ্ধতি এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধে শীঘ্রই রমেশচন্দ্র লড কর্জ্জনকে উদ্দেশ করিয়া কয়েকটি খোলা চিঠি লিখেন; সেইগুলি সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। ইংলণ্ডে যাইয়া তিনি এই খোলা চিঠিগুলিকে (open letters) পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। এইগুলিতে তিনি বহু তথ্যের সমাবেশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বিলাতের বহু অবসর-প্রাপ্ত সিবিলিয়ানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তদানীন্তন ভারত সচিবের নিকটে একখানি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। উহাতে রাজস্বের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ ছিল। বলা বাহুল্য ইহাও রমেশচন্দ্রের চেষ্টারই ফল।

রমেশচন্দ্র কেবল কয়েকখানি খোলা চিঠি লিখিয়া ও আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। তিনি ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস সঙ্কলনের উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। শুনা যায়, তিনি প্রায় ২০০ খণ্ড 'ব্লুবুক' সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তকে সরকারী তথ্য সমূহ সন্নিবেশিত থাকে। এই সকল পুস্তক হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তিনি ব্রিটিশ ভারতের রাজস্ব,

ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও আয়-ব্যয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে ব্রতী হন। পলাসীর যুদ্ধের সময় হইতে বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘকালের অর্থনৈতিক তথ্যের সমাবেশ তিনি তাঁহার এই বিরাট গ্রন্থে করেন। পুস্তকখানি অবশ্য ইংরাজী ভাষায় লিখিত। পুস্তকখানির নাম—Economic History of British India অর্থাৎ ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস। ইহা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ছাপা হইয়া বাহির হইয়াছিল। ভারতের শিল্প-বাণিজ্য এবং ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধে ইহা একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের কয়েকটী সংস্করণও হইয়া গিয়াছে এবং পণ্ডিতসমাজে ইহার যথেষ্ট আদর আছে।

এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর ভারত সরকারের দৃষ্টি এদেশের শিল্পোন্নতির দিকে কতকটা পড়িয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতজাত শিল্প দ্রব্যকে উৎসাহিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বহু জেলায় রাজস্বের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকবার জমি জরিপের সময়েই যে রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে হইবে,—এইরূপ কল্পনা অনেকটা ত্যাগ করা হইয়াছে। শস্য উৎপন্ন না হইলে কৃষকদিগকে রাজস্ব ছাড়িয়া দিবার নিয়মও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে কৃষকদিগের কষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইয়াছে। যে সকল জমীর মালিক-জমীদারগণ, সেই সকল জমির রায়তদিগকে প্রজাস্বত্ব আইনে যে সকল সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল সুবিধা খাস সরকারী জমির রায়তদিগকে এখনও দেওয়া হয় নাই।

বরোদার রাজস্ব-সচিব।

সাত বৎসর ইংলণ্ডে কঠোর কর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিয়া রামেশ চন্দ্র ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ভারতে প্রত্যাগমন করেন।

এই সময়ে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। রমেশচন্দ্রের কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বরোদার মহারাজা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পড়েন এবং একাধিকবার তাঁহাকে তাঁহার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেন। সাক্ষাৎকারে পরস্পরে নানারূপ আলাপ আলোচনা হয়।

রমেশচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় আসিলে বরোদার মহারাজা তাঁহাকে তারযোগে তাঁহার রাজস্ব-সচিবের পদ গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করেন। রমেশচন্দ্র এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন নাই। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাল তিনি বরোদার রাজস্ব-সচিব ছিলেন। তাঁহারই উপদেশ অনুসারে বরোদার মহারাজা ৩০ লক্ষ টাকা রাজস্ব মকুব করেন। ইহাতে কৃষক-কুলের উপর হইতে এক বিপুল 'বোঝা' অপসারিত হয়। গরীব কারিগরদিগের উপর একরূপ কর নিদ্ধারিত ছিল, দত্ত মহাশয়ের পরামর্শে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। ফেরিওয়ালা ও দিনমজুরদের নিকট হইতেও কর লওয়া হইত, তাহা রদ করা হয়। এই সকলের স্থলে ধনী ব্যক্তিদিগের উপর আয় কর (Income tax) বসান হয়। প্রথমে ১৫০৲, পরে ৩০০৲, তৎপরে ৫০০৲, শেষে যখন রমেশচন্দ্র অবসর লয়েন তখন ৭৫০৲ টাকা বার্ষিক আয় হইলে তাহার উপর কর লইবার নিয়ম হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির পরিপন্থী শুল্ক রহিত করিয়া তিনি কতকগুলি প্রধান প্রধান দ্রব্যের উপর শুল্ক স্থাপিত করেন। এই সকল সংস্কারে রাজস্বের ক্ষতি না হইয়াই বৃদ্ধি ঘটে। শুল্ক রহিত করিয়া দেওয়ায় বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটিবার ফলে রাজস্বের পরিমাণ অন্যদিকে বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

রাজভাণ্ডার হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠানে সহায়তা করিবার ব্যবস্থা করা হয়। বে-সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত রাজকীয় শিল্প

প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বরোদার রাজকীয় কটন মিল একটি বে-সরকারী যৌথ ব্যবসায়ী সমিতিকে বিক্রয় করা হয়। ইহার ফলে অল্পদিন মধ্যে আরও দুইটী কাপড়ের কল তথাকার ব্যবসায়ীরা স্থাপিত করেন। আরও কতকগুলি তুলার কল ও অন্যান্য নানাপ্রকার কলকারখানা রমেশচন্দ্রের শাসন-ব্যবস্থার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে, চারিদিকে শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ক্রমে শ্রমিকদের মজুরা বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিও ঘটে।

রমেশচন্দ্রের উপদেশে বরোদার রাজস্ব ও বিচার-বিভাগের পদ সমূহের উন্নতি করা হয় এবং এগুলির ক্রমিক শ্রেণীবিভাগও করিয়া দেওয়া হয়। পদোন্নতির সহিত বেতন বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ব্যতীত অপর কাহাকেও 'গেজেটেড্ অফিসার' করিবার নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া হয়। বিচার ও শাসন বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়। সেইরূপ ব্যবস্থাই তথায় আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। রাজকর্ম্মচারীদিগের সফর ও পরিদর্শন ব্যবস্থার উপর দত্ত মহাশয়ের বিশ্বাস ছিল। এইজন্য তিনি রাজকর্ম্মচারীদিগকে সফর করিতে বলিতেন। তিনি নিজে সকল জেলা এবং প্রায় সকল তালুক পরিদর্শন করিয়াছিলেন। মোট কথা, রমেশচন্দ্র বরোদায় একরূপ পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন-পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। গ্রাম্য সমিতিগুলির উপর তিনি গ্রাম-শাসনের সাধারণ ভার প্রদান করিয়াছিলেন। পল্লীর 'সেস' (Cess) করের টাকা গ্রাম্য বোর্ড সমূহের হস্তে দেওয়া হইত। এই টাকায় গ্রামের হিতকর অনেক কার্য্য হইত, যথা—প্রাথমিক পাঠশালা স্থাপন, কূপ খনন, গ্রাম্য পথ নির্ম্মাণ ইত্যাদি। এই সকল কর্ম্ম এত সুন্দররূপে সম্পন্ন হইত যে, রাজপুরুষগণ পরিদর্শন করিতে আসিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া পারিতেন না। বরোদার এইরূপ শাসন কার্য্যের উন্নতিসাধন করিয়া রমেশচন্দ্র

১৯০৭ সালের জুলাই মাসে অবসর গ্রহণ করেন। বরোদার লোকে তাঁহাকে দরিদ্রকা দোস্ত বা দরিদ্রবন্ধু বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল।

অতঃপর রমেশচন্দ্র ডিসেন্ট্রালাইজেশন্ কমিশনের সদস্য পদে বৃত হন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কমিশনের সদস্যগণ বিলাত হইতে বোম্বাই বন্দরে অবতীর্ণ হন। সেই সময়ে রমেশচন্দ্রও বোম্বাই সহরে উপস্থিত হন। ইহার পূর্ব্বে তিনি দক্ষিণ ভারত পরিদর্শন করিয়াছিলেন। মহীশূর, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যও তিনি দেখিয়াছিলেন। এই সকল রাজ্যে উপস্থিত হইলে তিনি সসম্মানে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ত্রিচিনপল্লী, মাদুরা, তাঞ্জোর এবং কুম্বাকোনামে তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শত শত শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। মাদ্রাজের পাচাইয়াপ্পা কলেজে তিনি ভারতের ইতিহাস অনুশীলন সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ডিসেন্ট্রালাইজেশন কমিশনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। কমিশন সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ পরিভ্রমণ করেন ও বহু লোকের সাক্ষ্য লয়েন। কমিশন অবশ্য শাসন সংস্কার এবং শাসন-নীতির ভিত্তি-সম্প্রসারণের সম্পর্কে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা এমন কতকগুলি প্রস্তাবও করিয়াছিলেন যেগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে বিভাগীয় কমিশনার ও কলেক্টরদিগের স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে পারিত। কমিশনের যে সকল প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে দেশের হিতকর বলিয়া বুঝিয়াছিলেন রমেশচন্দ্র সেই সকলের সমর্থন করিয়াছিলেন এবং যেগুলি অহিতকর মনে করিয়াছিলেন সেই গুলির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এই কমিশনে মাত্র একজন দেশীয় সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই একজন—একজনের মত একজন—রমেশচন্দ্র

দত্ত, দেশবাসীর অভিমত স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে বলিতে কমিশনে ইঁহার মত ব্যক্তি সত্যই বিরল।

কমিশন ভারতে তাঁহাদের কার্য্য শেষ করিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রিপোর্ট লিখিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। রমেশচন্দ্রও সেই সঙ্গে বিলাত যাত্রা করেন।

মর্লির শাসন-সংস্কার ও রমেশচন্দ্র।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের সমগ্র গ্রীষ্মকাল ও শরৎ কাল দত্ত মহাশয় লণ্ডনে অতিবাহিত করেন। সেই সময়ে লর্ড মর্লি ভারত শাসন-সংস্কারের একটি খসড়া তৈয়ারী করিতেছিলেন। লর্ড মর্লি এ সম্বন্ধে প্রত্যেক অভিজ্ঞ ইংরাজ ও ভারতবাসীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিতে উৎসুক ছিলেন। দত্ত মহাশয় লর্ড মর্লির সহিত প্রতিনিয়তই পত্র ব্যবহার করিতেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী তারিখে তিনি যে পত্র কলিকাতা হইতে লর্ড মর্লিকে লিখিয়াছিলেন, তাহার সারমর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম; ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শাসন-নীতির সংস্কার-সাধনে অর্থাৎ শাসন ব্যাপারে দেশবাসীর অধিকার লাভ সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ চেষ্টা ছিল এবং এ পক্ষে কোথায় আঘাত করিলে চেষ্টা ফলবতী হইবে তাহা তিনি ভালরূপে জানিতেন। তিনি ঐ পত্রে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই:—খাস সরকারের হুকুমেই ভারতবর্ষে শাসন-নীতির বড় বড় পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এ সকল ব্যাপারে জনসাধারণের কোনও হাতই থাকে না; জনসাধারণকে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতেই দেওয়া হয় না। বড়লাটের শাসন-পরিষৎ মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের শাসন-পরিষৎ। অন্যান্য প্রদেশে ছোটলাট ও চীফ কমিশনারগণ রাজস্ব বিভাগ, জলসেচ বিভাগ, পুলিশ, পূর্ত্তবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, চিকিৎসাবিভাগ, বনবিভাগ-সংক্রান্ত

প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সমাধান আপনাদের অভিমত অনুসারেই করিয়া থাকেন। অথচ এই গুলিই শাসন-নীতির প্রধান প্রধান অঙ্গ। শাসন-নীতির যখন অঙ্গবিন্যাস হয়, তখন কর্ত্তারা নিজেদের খেয়াল মতই তাহা করিয়া থাকেন। দেশের লোককে বিশ্বাস করিয়া ইহার মধ্যে লওয়া হয় না। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের লোকপ্রিয়তা যে যথেষ্ট কমিয়া যায় তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। জনমতকে শাসন-নীতির অনুকূল করিয়া লওয়া উচিত।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২২ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি লর্ড মর্লিকে আর একখানি পত্র লিখেন। তাহার মর্ম্ম এই :—এই সময়ে আমার মনে হয় গবর্ণমেণ্টের সাহসের সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত। তাহাই এই সন্ধিক্ষণে বিজ্ঞোচিত কার্য্য হইবে। যদি আপনারা অসন্তোষ ও বিদ্বেষ লোকের মন হইতে একেবারে দূর করিতে চান, তাহা হইলে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন বাঙ্গালা দেশকে আবার সংযুক্ত ও সম্মিলিত করিয়া দিন। এই কার্য্য করিলে গবর্ণমেণ্ট জনপ্রিয় হইতে পারিবেন।

লর্ড মর্লির শাসন-সংস্কারের খসড়া যখন রচিত হইতেছিল সেই সময়ে রমেশচন্দ্র পার্লামেণ্টের লর্ড মহাসভার কতিপয় সদস্যের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাদের সহিত ভারত-শাসন সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কমন্স মহাসভারও কতিপয় সদস্যের সহিত তাঁহার এই বিষয়ে আলোচনা ও বিচার-বিতর্ক হইয়াছিল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যতদিন তিনি বিলাতে ছিলেন ততদিন তিনি স্বয়ং ও বন্ধু-বান্ধবের দ্বারা ভারতের প্রকৃত শাসন সংস্কার যাহাতে হয় সেই জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই সকল স্বদেশহিতকর প্রচেষ্টায় দত্ত মহাশয় মহামতি গোখ্‌লের সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। গোখ্‌লের সহযোগিতা লাভ করিয়া রমেশচন্দ্র খুবই আশান্বিত হইয়াছিলেন।

মর্লি যেভাবে শাসন নীতির সংস্কার সঙ্কল্প করেন তাহা অবগত হইয়া রমেশচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, এইবার এদেশের লোকে শাসন ব্যাপারে কিছু অধিকার লাভ করিলেন .

বরোদার প্রধান মন্ত্রী।

রমেশচন্দ্র ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাস হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এবার তিনি কলিকাতায় আসিয়া হাঙ্গারফোর্ড ষ্ট্রীটে তাঁহার নূতন বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। এই বৎসর এপ্রিল মাসে মাননীয় এস-পি সিংহ (তৎপরে লর্ডসিংহ; বড়লাটের ব্যবস্থা সচিব নিযুক্ত হইলেন। এরূপ উচ্চপদে ভারতীয়ের নিয়োগ এই প্রথম। রমেশচন্দ্র যাহা চাহিতেন তাহাই ঘটিল দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। ১ লা জুন মাসিক ৪০০০৲ টাকা বেতনে তিনি বরোদার দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রীরূপে পুনরায় তথাকার কর্ম্মভার গ্রহণ করেন। বরোদার লোকে এজন্য অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সে আনন্দ বড় বেশীদিন রহিল না।

মৃত্যু।

গুরু পরিশ্রমে রমেশচন্দ্রের হৃদ্‌রোগ হইয়াছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উহা প্রথম দেখা দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়াছিল। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে বিশ্রামগ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্রাম এই কর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির স্বভাবের অনুকূল ছিল না। তিনি বিশ্রাম করিতে পারিতেন না,—জানিতেনও না। তাহার উপর বরোদার প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভাগ্যে আর বিশ্রামলাভ ঘটিয়া উঠিল না। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টোর আগমন উপলক্ষে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য তাঁহাকে গুরুপরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার শরীরে এই শ্রমসাধ্য কার্য্য আর সহ্য হইল না। হৃদ্‌রোগ আবার দেখা দিল।

তাঁহার শেষ জীবনের একটি সুখজনক ঘটনা এই যে এই সময়ে তাঁহার আবাল্য বন্ধু বিহারি লাল গুপ্ত মহাশয় বরোদার ব্যবস্থা সচিব নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং দুই বন্ধু একত্র অবস্থান ও কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর বড়লাট বাহাদুর বরোদায় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য রাত্রিতে মহাভোজের আয়োজন হইয়াছিল। ভোজ আরম্ভ হইল। কিন্তু ভোজনে বসিবার পরেই রমেশচন্দ্রের হৃদ্‌পিণ্ডে বিষম যন্ত্রণা হইতে লাগিল। এরূপ ভোজ সভা হইতে তাঁহার ন্যায় রাজ্যের ধুরন্ধর ব্যক্তির উঠিয়া যাওয়া অশোভন ও অপ্রীতিকর হইবে ইহা বুঝিয়া তিনি ধীরভাবে সেই যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। তারপর ভোজ-সভা ভঙ্গ হইলে রমেশচন্দ্র বাসায় আসিয়া শয্যাশায়ী হইলেন। স্ত্রী পুত্র কন্যা কেহই নিকটে নাই; আছেন কেবল অভিন্ন হৃদয় সুহৃদ্‌ বিহারি লাল। তিনি রমেশচন্দ্রের পত্নী ও পুত্রকে আসিবার জন্য তার করিলেন। তাঁহারাও উপস্থিত হইলেন। চিকিৎসা ও শুশ্রূষা সুচারুরূপেই চলিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দুই সপ্তাহ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৩০শে নভেম্বর বেলা ১টার সময়ে তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন। বরোদায় বিশ্বামিত্র নদের তীরে কেদারেশ্বর মহাশ্মশানে কেবল রাজবংশীয়গণেরই মৃতদেহের সৎকার হইয়া থাকে। মহারাজ গাইকোবাড়ের আদেশে রমেশচন্দ্রের শবদেহের সৎকার এই শ্মশানেই হইল। রমেশচন্দ্রের নশ্বরদেহ চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হইল বটে, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি চিরদিন অবিনশ্বর থাকিবে।



স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গজননী স্বর্ণপ্রসূ। এদেশে কত শত মহাপুরুষ, কত শত মনীষী, কত শত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ন্যায় বিজ্ঞানবিদ্, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় রাসায়নিক, ডক্টর রাসবিহারীর ন্যায় ব্যবহারাজীব, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় ঔপন্যাসিক, সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় বাগ্মী, আশুতোষের ন্যায় মনস্বী সন্তানের জন্ম শুধু এদেশেই সম্ভব হইয়াছে। আবার পারিপার্শ্বিক পাশ্চাত্য বিলাস-ব্যসনের মধ্যে আপন জাতিগত, বর্ণগত ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে ঐশ্বর্য্যের রজত-শুভ্র প্রাসাদে আরোহণ করিয়াছিলেন এই দেশেরই গুরুদাস। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর ও মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গারোহণের পর হিন্দুত্বের ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিপালক স্যর গুরুদাসের ন্যায় আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। গুরুদাস হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন, এজন্য তিনি দেশবাসীর বরেণ্য নহেন; গুরুদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যানেসলার ছিলেন, এজন্যও তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘ্য পান নাই; গুরুদাস ধনী ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, এজন্যও তিনি দেশবাসীর বন্দনীয় হন নাই; গুরুদাস চিরস্মরণীয় হইয়াছেন তাঁহার সরলতা, অমায়িকতা, বিনয়, নম্রতা, সত্যবাদিতা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের জন্য। গুরুদাসের চরিত্রে যাহা কিছু মহৎ—যাহা কিছু গরিষ্ঠ—যাহা কিছু শ্লাঘ্য তাহা এইখানেই নিহিত। ইরেজী সাহিত্য-সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া, ইংরেজের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন করিয়া, অহোরাত্র ইংরেজ সহকর্ম্মী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গুরুদাস আপন স্বাতন্ত্র, আপন ধর্ম্ম,

আপন পিতৃ-পিতামহের অনুসৃত পথ হইতে বিন্দুমাত্র স্খলিত হন নাই। ইহাই গুরুদাসের বৈশিষ্ট্য।

জেলা চব্বিশপরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবারের নিকটবর্ত্তী বোরা গ্রামে মহাত্মা গুরুদাসের পূর্ব্বপুরুষগণ বাস করিতেন। তাঁহার পিতামহ মাণিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অর্থোপার্জ্জন-মানসে নিভৃত পল্লীগ্রাম হইতে কর্ম্ম-কোলাহলময় কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় আসিয়া দেখেন যে, ইংরেজী ভাষায় একটু অধিকার লাভ না করিলে চাকুরী হওয়া সুকঠিন, কাজেই তিনি সেই বয়সেই ইংরেজী শিখিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি যখন তাদৃশ অধিক বয়সে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অনেকে তাঁহার এই ব্যবহার দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। কিন্তু মাণিকচন্দ্র নিরুৎসাহ বা ভগ্নোৎসাহ হইবার পাত্র নহেন। ইংরেজী ভাষায় কতকটা অধিকার লাভ করিয়া তিনি মেসার্স গুল ক্যামেল এণ্ড কোম্পানীর অধীনে মাসিক ৫৫৲ টাকা বেতনে একটি চাকুরীর জোগাড় করিলেন। তখনকার দিনে খাদ্য-দ্রব্যাদি অত্যন্ত সস্তা থাকায় মাসিক ৫৫৲ টাকা নিতান্ত সামান্য বেতন ছিল না। সৌভাগ্যলক্ষ্মী মাণিকচন্দ্রের উপর কৃপাকটাক্ষ করায় তিনি নারিকেলডাঙ্গায় একখণ্ড জমি ক্রয় করেন এবং সেইখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন।

জন্ম-বিবরণ

গুরুদাসের পিতা রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মেসার্স কর ঠাকুর এণ্ড কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিতেন। তিনি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী স্যর গুরুদাসের জন্ম হয়। রামচন্দ্র তাঁহার শিশুপুত্র গুরুদাসকে ক্রোড়ে করিয়া প্রতিদিন গীতাপাঠ করিতেন আর শিশু গুরুদাস তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া গীতা-পাঠ শ্রবণ করিতেন। কে জানিত

শিশুর কোমল অন্তরে তখন গীতার যে অমৃতময় শ্লোক অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা কালে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া জ্ঞান ও কর্ম্মরূপে মহামহীরুহে পরিণত হইবে ?

পিতৃবিয়োগের পর স্যর গুরুদাসের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার মাতার উপর পতিত হয়। তাঁহার মাতা সোনামণি দেবী পণ্ডিত রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায় ন্যায়বাচস্পতির কন্যা। তিনি অতি গুণবতী, ধর্ম্মপরায়ণা ও সাধ্বী মহিলা ছিলেন। পুত্র গুরুদাসকে উপযুক্ত পরিমাণে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়াই তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল। মাতার অভিভাবকত্বে মহাত্মা গুরুদাস বাটীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতেন; বিশেষ কোনও প্রয়োজন না হইলে তিনি কখনও বাহিরে যাইতে পারিতেন না। কাজেই গুরুদাস কলিকাতার ন্যায় বিলাসিতাপূর্ণ সহরে লালিত-পালিত হইলেও সহরের পাশ্চাত্য সভ্যতা বিন্দুমাত্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার মাতা গুরুদাসকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, তিনি গুরুদাসকে ক্রোড়ে লইয়া কখনও চুম্বন করিতেন, কখনও বা নানা গল্প বলিয়া তাঁহাকে আমোদিত করিতেন। কিন্তু তাই বলিয়া সোনামণি পুত্রের প্রতি অন্ধ-স্নেহপ্রযুক্ত কখনও তাহার দোষ দেখিলে উপেক্ষা করিতেন না। এইভাবে মায়ের আদর-যত্ন ও শাসনের মধ্যে বালক গুরুদাস পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

মাতাপুত্র

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পিতা রামচন্দ্রের মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র গুরুদাস ও বিধবা পত্নী সোনামণি অতি অসহায় অবস্থায় ছিলেন। স্যর গুরুদাস ছাত্রজীবন ভরিয়া দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাত সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু শত দারিদ্র্য তাঁহার অধ্যয়ন-লিপ্সা বিন্দুমাত্র হ্রাস করিতে পারে নাই। "যাদৃশী ভাবনার্যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—এই প্রবাদ-বাক্যটী স্যর গুরুদাসের

পাঠ্য-জীবন

জীবনে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছিল। নয় বৎসর বয়সে তিনি জেনারল এসেম্ব্লী ইন্‌ষ্টিটিউসনে ভর্ত্তি হন। জেনারল এসেম্ব্লী তখন অবৈতনিক বিদ্যালয়।

কিন্তু বেশীদিন জেনারল এসেম্ব্লী ইন্‌ষ্টিটিউসনে অধ্যয়ন করা গুরুদাসের ভাগ্যে ঘটিল না। তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় তিনি অল্পদিন-মাত্র জেনারল এসেম্ব্লীতে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার পর তাঁহার মাতুল তাঁহাকে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে স্থানান্তরিত করিলেন। এখানেও গুরুদাস বেশীদিন অধ্যয়ন করিতে পারিলেন না। শীঘ্রই তিনি ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ছাড়িয়া হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী তখন গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল নামে পরিচিত ছিল। এইখানে আসার পর হইতেই তাঁহার স্ফুটোনোন্মুখ প্রতিভার বিকাশ হইতে লাগিল। তিনি অষ্টম শ্রেণী হইতে একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে এবং পঞ্চম শ্রেণী হইতে একেবারে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হেয়ার স্কুল তখন কলুটোলা ব্র্যাঞ্চ স্কুল নামে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি পুরাতন অট্টালিকায় এই স্কুল স্থাপিত ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি স্কুলের যাবতীয় পরীক্ষার্থী মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। হেয়ার স্কুলে অধ্যয়নকালে গুরুদাস স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকারের নিকট পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে স্যর গুরুদাস অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার শিক্ষক প্যারীচরণ সরকারের মনে নৈরাশ্যের মেঘ সঞ্চারিত হইয়াছিল। প্যারীচরণ স্বয়ং গুরুদাসের বাটীতে আসিয়া একখানি পাল্কীতে করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা-মন্দিরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরীক্ষা শেষ হইলে প্যারীচরণ

আশার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন—"এতদিনে আমার দুর্ভাবনা দূর হইল।" গুরুদাসও শিক্ষকের আশা সফল করিয়াছিলেন, তিনি সেই পরীক্ষায় হেয়ার স্কুলের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

ছাত্রজীবনে প্রথম প্রথম গণিতশাস্ত্রে গুরুদাসের বিশেষ অধিকার ছিল না। জ্যামিতির মূলসূত্রগুলি তিনি প্রথমে ভালরূপে বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু অধ্যবসায় ও উদ্যমের সুফল কোথায় যাইবে? তিনি পরবর্ত্তী কালে গণিতশাস্ত্রে এতাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি বহুবিধ গণিত-পুস্তক ত রচনা করিয়াছিলেনই, তদুপরি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

স্যর গুরুদাস অতি অল্প বয়স হইতেই সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাটীতে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাস করিতেন, গুরুদাস তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিখিতেন। তিনি বাল্যাবস্থাতেই অমর কোষ অভিধানখানি সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে তিনি যে সংস্কৃতশাস্ত্রে এত ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, বাল্যকালের সংস্কৃতশাস্ত্রে অধিকারই তাহার মূল কারণ।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাস প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। প্রেসিডেন্সী কলেজ তখন বর্ত্তমান হিন্দু স্কুল ও সংস্কৃত-কলেজ-গৃহে স্থাপিত ছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেল বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, কালীনাথ মিত্র, সি-আই-ই ও মিঃ ও-সি মল্লিক তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় গুরুদাসের মহাপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। দুইজনে পরম বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকারের জন্য দুই বন্ধুর

কলেজে গুরুদাস

মধ্যে আবার জেদাজেদিও ছিল কম নয়। গুরুদাস যদি কলেজের কোন পরীক্ষায় হইতেন প্রথম, নীলাম্বর হইতেন দ্বিতীয়।

একবার একটি ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় গুরুদাসের জননী-হৃদয়ের মহত্ব ও ঔদার্য্যের পরিমাণ বুঝা যায়। গুরুদাস বি-এল পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকারেব আশায় নীলাম্বরবাবুকে পরাজিত করিবার জন্য গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সোনামণি শুনিতে পাইলেন যে, নীলাম্বর নামক একজন সহাধ্যায়ীকে পরাজিত করিয়া পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ও স্বর্ণ পদকটী লাভ করিবার জন্য গুরুদাস ঐরূপ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেছেন। এই কথা শুনিবামাত্র তিনি গুরুদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, বছর বছর তুমিই ত পরীক্ষায় প্রথম হও, এবার না হয় সেই ছেলেটিই হোক। পড়াশুনার ব্যাপারে কি হিংসে কর্‌তে আছে যাদু! আহা! সেই ছেলেটী যখন পাশ ক'রে সোনার চাক্‌তীখানি (স্বর্ণ পদক) বাড়ীতে নিয়ে যাবে তখন তার মা-বাপের কি আনন্দ হ'বে ভাব দেখি!"

মায়ের কথা শুনিয়া গুরুদাস আর অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িতেন না। কিন্তু না পড়িলে কি হয়? বি-এল্‌ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল গুরুদাস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

গুরুদাসের পূর্ব্বে এফ-এ পরীক্ষা ছিল না। তৎপরিবর্ত্তে সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষা নামে একটি পরীক্ষা গৃহীত হইত। এফ-এ পরীক্ষা গুরুদাসের সময়েই আরম্ভ হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে গুরুদাস কয়েকজন বিখ্যাত অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। অধ্যাপক কাউয়েল, সাটক্লিফ, সণ্ডার্স, লব, জোন্‌স্‌, ষ্টিফেন্‌সন্‌, রীজ, হ্যাণ্ড, প্যারীচরণ সরকার ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। প্যারীচরণ সরকার মহাশয় তখন হেয়ার স্কুল ছাড়িয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া যোগদান করিয়াছেন এবং তিনি ছাত্র-

দিগের প্রবন্ধাদি সংশোধন করিতেন। গুরুদাস সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার বিশেষ সুনাম ও সুখ্যাতি ছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদবধ" যখন প্রকাশিত হয় তখনও স্যর গুরুদাস বি-এ পাশ করেন নাই। মাইকেলের "মেঘনাদবধ" অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হওয়ায় দেশের প্রায় তাবৎ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত একবাক্যে গ্রন্থখানির নিন্দাবাদ করেন। কিন্তু সেই সময়ে একটীমাত্র যুবক বঙ্গদেশে মেঘমন্দ্রে "মেঘনাদবধে"র গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন; তিনি মহাত্মা গুরুদাস। গুরুদাস্ "মেঘনাদবধ" পাঠ করিয়া, উহার প্রতি ছন্দে, প্রতি অক্ষরে, প্রতি বাক্যে অমৃত-নিষ্যন্দিনী কবিত্বের ঝঙ্কার দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। "মেঘনাদবধ" বি-এ পরীক্ষার পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাস বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

গুরুদাসের এম্-এ পাশ করিবার পূর্ব্বে একটা নিয়ম ছিল যে, যদি কেহ বি-এ পাশ করিবার একমাস পরে এম্-এ পাশ করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাকে পদক ও বৃত্তি পুরস্কার প্রদান করা হইত। আর যদি বি-এ পাশ করিবার একবৎসর পরে কেহ এম্-এ পাশ করিত, তাহা হইলে সে আর বৃত্তি পাইত না। গুরুদাস যে বৎসর বি-এ পাশ করেন সেই বৎসরে এই নিয়ম উঠিয়া যায়। গুরুদাস বি-এ পাশ করিবার এক বৎসর পরে এম্-এ পাশ করেন এবং গণিতশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁহার সঙ্গে সেই বৎসরে আরও কয়েকজন বিভিন্ন বিষয়ে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, যথা নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ও-সি মল্লিক ও ব্লকম্যান। তখনকার দিনে টাউন হলে প্রবেশিকা পরীক্ষা আর হিন্দু স্কুলে ও আলবার্ট কলেজে বি-এ, এম্-এ প্রভৃতি পরীক্ষা গৃহীত হইত।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাস এম-এ ও ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাস প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হন, কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (বিচারপতি আশুতোষ নহেন) বৃত্তি লাভ করায় তিনি তাহাতে অকৃতকার্য্য হন।

এস্থলে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন যে, বি-এ পাশ করিবার অব্যবহিত পরেই গুরুদাস প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন তখন তাঁহার ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাস আইনের অনার্স পরীক্ষায় পাশ হন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডি-এল উপাধি পান। তখন তিনি হাইকোর্টের উকিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পি-এইচ্-ডি উপাধি লাভ করেন।

এম্-এ পরীক্ষা পাশ করিবার পর'ও গুরুদাস পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে গণিতের অস্থায়ী অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। গুরুদাসের এইবার অধ্যাপকতা-পদ-লাভ-সম্বন্ধে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে। প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ীভাবে একজন গণিতের অধ্যাপক প্রয়োজন —এই কথা শুনিয়া গুরুদাস ডিরেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখনকার দিনে শীতকালে ভদ্রলোকের পোষাকই ছিল একখানি লাল বনাত ও সাদা ধুতি। গুরুদাসও একখানি লাল বনাত গায়ে দিয়া, একখানি সাদা ধুতি পরিয়া ডিরেক্টর মহোদয়ের নিকট উপস্থিত হন। ডিরেক্টর তাঁহাকে দেখিয়াই ভাবিলেন, এ ব্যক্তি বোধ হয় কোনও টোলের পণ্ডিত। কাজেই গুরুদাস যখন যাইয়া ডিরেক্টরকে বলিলেন, "আপনার অধীনে একটি অধ্যাপক-পদ খালি আছে, আমি সেই পদপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছি" তখন গুরুদাসের সেই কথা শুনিয়াই ডিরেক্টর একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "না গো মহাশয় আমার অধীনে কোন পণ্ডিতের প্রয়োজন নাই।" ডিরেক্টরের কথা শুনিয়া গুরুদাস বলিলেন,

"আমি পণ্ডিত নহি, প্রেসিডেন্সী কলেজে যে অধ্যাপকের পদ খালী আছে আমি সেই পদের জন্য আসিয়াছি, আমি একজন এম্-এ"। "এম্-এ"—এই কথা অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিয়া ডিরেক্টর মহাশয় তাঁহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং তাঁহার যোগ্যতার বিষয় শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে তাঁহার নিকট রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত এবং আনন্দচন্দ্র বড়ুয়া প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের দেশ-প্রসিদ্ধ মনীষিগণ গণিত শিক্ষা করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অঙ্কে বিশেষ অধিকার ছিল না। ইহা দেখিয়া গুরুদাস বলেন, "দেখ রমেশ, এফ-এ পরীক্ষার গণিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নিউটন বা ল্যাপলাসের মত মস্তিষ্ক না থাকিলেও চলে, কেবল একটু চেষ্টা ও একটু মনোযোগ যদি দাও, তবে অনায়াসেই তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পার।" গুরুদাসের মুখে আশার কথা শুনিয়া রমেশচন্দ্র অঙ্কের প্রতি মনোযোগ দিলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে এতাদৃশ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন যে, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি গণিতে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেনারল এসেমব্লী ইনষ্টিটিউশনে (এক্ষণে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) গণিতের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি পাঁচমাসকাল কার্য্য করিয়াছিলেন। পঞ্জাব চীফ্ কোর্টের বিচারপতি প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন তাঁহার ছাত্র ছিলেন। আর স্কুল ও কলেজ-জীবনে যিনি তাঁহার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন উক্ত কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বি-এল পরীক্ষা পাশ করিবার পর গুরুদাস জেনারেল এসেমব্লি ইনষ্টিটিউটশনের অধ্যাপকতা পরিত্যাগ করিয়া আইন-ব্যবসায়ে যোগদান করিতে সঙ্কল্প করেন। কিন্তু শিক্ষকতার প্রতি তাঁহার এতটা অনুরাগ ছিল যে, তিনি পাটনা কলেজে একটি অধ্যাপক-পদ শূন্য আছে ও গৌহাটী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদও শূন্য

আছে শুনিয়া তিনি এই উভয় পদের জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছা করেন। পাঠকগণ কেহ গৌহাটী স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন না। তখন ঐ পদের বেতন ছিল মাসিক ৩০০৲ শত টাকা। তখন রেলপথ না থাকায় মফঃস্বলে যাওয়া নিতান্ত সহজসাধ্য ছিল না। গুরুদাস-জননী পুত্রের অভিপ্রায় শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "বাবা কলিকাতায় থাকিয়া যাহা পাইতেছ যখন তাহাতেই তোমার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছে তখন আর মফঃস্বলে যাইয়া লাভ কি?" সেবার গুরুদাস মায়ের কথায় মফঃস্বল যাওয়া বন্ধ করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই বহরমপুর কলেজ হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল। এই কলেজে অধ্যাপনা করিলে তিনি মাসিক তিন শত টাকা বেতন ত পাইবেনই, অধিকন্তু ওকালতীও করিতে পারিবেন। পাছে মাতা সোনামণি পুত্রের কথা শুনিয়া কোনও রূপ আপত্তি করেন —এই ভয়ে মাতুলের দ্বারা মাকে ধরিয়া অনুমতি লইয়া গুরুদাস বহরমপুরে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্যলক্ষ্মীও হাসিতে হাসিতে তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

বহরমপুরে

বহরমপুরে উপস্থিত হইয়া গুরুদাস মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন বন্ধু ও সহায়ক প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও আপন প্রতিভা-বলে যুবক গুরুদাস অল্পদিনের মধ্যে মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের আইনের পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইলেন। কলেজে তিনি আইন ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে গণিত শিক্ষা দিতেন। বহরমপুরে ওকালতী আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে গুরুদাস উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ফৌজদারী মকদ্দমায় অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুরে অধ্যাপকতা করিবার সময়েই গুরুদাস দুই সপ্তাহের ছুটী লইয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। কিন্তু

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত বৃত্তি লাভ করায় তিনি বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যান। বহরমপুরে ফিরিয়া গুরুদাস সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তখন বহরমপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। গুরুদাস স্কুলের ছাত্রের ন্যায় তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি "দায়ভাগ"-অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলা, রঘুবংশ, কুমারসম্ভবাদি নাটকও অধ্যয়ন করিলেন। এই সংস্কৃতশিক্ষা বিফল হয় নাই। একবার পিতৃগৃহে থাকিয়া একটি স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর সম্পত্তি উপভোগ করিবার জন্য আদালতে নালিশ করিলে গুরুদাস শকুন্তলার একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে ধারণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোক হাজার সতী হইলেও কেবলমাত্র পিতৃগৃহে থাকিলে লোকে তাহাকে অসতী বলিয়া সন্দেহ করে। শ্লোকটী এই—

"সতীমপি জ্ঞাতিকুলৈক সংশ্রয়াং
জনোন্যথা ভর্ত্তৃমতীং বিশঙ্কতে
অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে
প্রিয়াঽপ্রিয়া বা প্রমদাস্ববন্ধুভিঃ"

এই মোকদ্দমায় গুরুদাস জয়ী হইয়াছিলেন। ফলে সমগ্র বহরমপুর জেলায় তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

স্যর গুরুদাস কখনও উপকারীর উপকার বিস্মৃত হইতেন না। কলিকাতা হাইকোর্টে যখন তিনি বিচারপতি তখন পণ্ডিত রামগতি তাঁহাকে লেখেন, "কর্ত্তৃপক্ষ আমার মাসিক পেন্সনের পরিমাণ ত্রিশ টাকা কমাইয়া দিয়াছেন, অতএব তুমি যদি একবার শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে ডিরেক্টরের দৃষ্টি আকৃষ্ট কর, তাহা হইলে আমার পূর্ণ পেন্সন হইতে পারে।" স্যর

গুরুদাসের সহিত ডিরেক্টর মিঃ ক্রফ্‌টের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি যদি ডিরেক্টরবাহাদুরকে একটুমাত্র অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলে যে কৃতকার্য্য হইতেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি সে শ্রেণীর লোক ছিলেন না। তিনি পণ্ডিত রামগতিকে লিখিলেন যে, যতদিন তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি থাকিবেন ততদিন তিনি প্রতি মাসে তাঁহাকে ত্রিশ টাকা পাঠাইবেন। পত্রের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুদাস-বাবু বহরমপুরে ত্রিশ টাকা ডাকযোগে প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিতমহাশয় অবশ্য একবার মাত্র গুরুদাসবাবুর প্রেরিত টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে গুরুদাস যে হৃদয়ের কত উচ্চতা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিরাছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

আইন-জ্ঞান।

বহরমপুরে অবস্থানকালে নবাব নাজিম বাহাদুর একবার তাঁহার নিকট একটি মকদ্দমায় আইনের পরামর্শ গ্রহণ করেন। গুরুদাসবাবুর পরামর্শ এতদূর যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল যে, হাইকোর্টের তদানীন্তন এড্‌ভোকেট মিঃ আর-ডি ডয়েন তাঁহার মতের সমর্থন করেন। তাঁহার পরামর্শমত কার্য্য করায় নবাব নাজিম ২০,০০০ বিশ হাজার টাকার ক্ষতি হইতে অব্যাহতি পান এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়া গুরুদাসবাবুকে একটি মূল্যবান টেঁকঘড়ি ও সোনার চেন উপহার দেন। আজিও সেই চেন-ঘড়ি স্যর গুরুদাসের বাটীতে সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

বন্ধুত্ব

বহরমপুরে স্যর গুরুদাসের ভাগ্যে অনেক প্রথিতযশা বন্ধু-লাভ হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, গঙ্গাচরণ সরকার, তৎপুত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামদাস সেন, আশুতোষ সেন ও দীননাথ গাঙ্গুলীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্যর গুরুদাস যে সময়ে বহরমপুরে উকিল সে সময়ে তথায় কোন

উকিল-সভা বা বার লাইব্রেরী ছিল না। আদালতের প্রবীণ উকিলগণ অবসরকালে আদালতের বারান্দায় বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেন আর নবীন উকিলগণ জজের কেরাণীর ঘরে বসিয়া গল্প-গুজবে সময় অতিবাহিত করিতেন। নবীন উকিলগণের এই সভাকে "নবরত্নের সভা"—এই আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইত। জজ-আদালতের প্রধান কেরাণী বৈকুণ্ঠনাথ নাগ এই সভার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। গুরুদাসবাবুও এই নবরত্ন সভার একজন সভ্য ছিলেন। তিনি এই সভাকে লক্ষ্য করিয়া একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটী এই—

হেঁয়ালীতে গুরুদাস

"উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেক না আর,
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হ'ল হের।

নানাগুণে গুণমণি বিক্রমাদিত্য নৃপমণি
হারায়ে ওগো জননি ছিলে বড়ই কাতর
সেই রাজা পুণ্যবান ভ্রমি স্বর্গ নানাস্থান
বৈকুণ্ঠেতে অধিষ্ঠান হ'য়েছেন এইবার
ল'য়ে নবরত্নগণে নানাশাস্ত্র আলাপনে
নানা সমস্যা পূরণে ব'সেছেন পুনর্ব্বার।

এই সভাতে অন্যান্য অনেক হাস্য-পরিহাসের মধ্যে হেঁয়ালী-সমস্যা রচিত ও তাহার উত্তর প্রদত্ত হইত। গুরুদাস হেঁয়ালি রচনায় ও পূরণে সুদক্ষ ছিলেন।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রামদাস সেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, গুরুদাস তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। গুরুদাস মাইকেল মধুসূদনের একজন পরম ভক্ত ছিলেন। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকেও তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন।

স্যর গুরুদাস যখন বহরমপুরে ওকালতী ও অধ্যাপকতা করিতে-ছিলেন, তখন স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ও বহরমপুরে ওকালতী ও ইংরেজীর অধ্যাপকতা করিতেছিলেন। একদিন স্যর রাসবিহারী গুরুদাসবাবুকে বলেন, দেখুন সংসারে যাঁহারা উন্নতি করিতে চান তাঁহাদিগের মফঃস্বল-আদালত ছাড়িয়া প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্র—কলিকাতায় যাওয়া উচিত। বলা বাহুল্য, স্যর রাসবিহারীর কথায় গুরুদাস কলিকাতায় আগমন করিতে সঙ্কল্প করেন।

হাইকোর্টে আগমন

বহরমপুরে অবস্থানকালে সৌভাগ্য-লক্ষ্মী নানাভাবে গুরুদাসবাবুর প্রতি কৃপা-কটাক্ষ করিলেও তাঁহাকে কয়েকটি প্রিয়জন-শোক সহ্য করিতে হইয়াছিল। বহরমপুর-অবস্থানকালে তাঁহার "মোহিনী" নাম্নী দেড় বৎসরের একটি পরমা সুন্দরী কন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বহুকাল হইতে গুরুদাসবাবুর মাতার এই আদেশ ছিল যে, ঘরে বসিয়া মাসে একশত টাকা আয়ের মত টাকা জমিলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইবে। সেই কথামত ঐরূপ আয়ের সংস্থান হইলেই তিনি বাটী ফিরিবার কথা বলিলেন। তাঁহার এই কথামত গুরুদাস আর বহরমপুরে থাকিতে পারিলেন না। তিনি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুরের বন্ধুবান্ধবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে যোগদান করিলেন। স্যর রাসবিহারীর আশা পরিপূর্ণ হইল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে স্যর গুরুদাস কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। বহরমপুরে ওকালতী করিয়া তিনি তৎপূর্ব্বেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, কাজেই হাইকোর্টে পশার করিতে তাঁহাকে অধিক কষ্ট পাইতে হইল না।

মাতৃভক্তি

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জাষ্টিস্ কানিংহাম জজীয়তি হইতে অবসর গ্রহণ

করিলে তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যর কোমার পেথারাম ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট স্যর গুরুদাসকেই ঐ পদের যোগ্য মনে করিয়া তাঁহার নাম প্রেরণ করেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রধান বিচারপতির অনুমোদনানুসারে প্রথমে ছয় মাসের জন্য গুরুদাসকে হাইকোর্টের বিচারপতি-পদে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হন। তাহার পর স্যর গুরুদাসের কৃতিত্ব দেখিয়া তাঁহাকে ঐ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার এই উচ্চপদ-প্রাপ্তিতে ভারতের সর্ব্বজন একবাক্যে আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছিল। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত গুরুদাস বিশেষ দক্ষতা ও যোগ্যতার সহিত এই গৌরবজনক পদে কার্য্য করিয়া ষাট বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ায় পেন্সন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার নিয়োগ-সময়ে যদিও এই ষাট-বৎসরের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই এবং তিনি ইচ্ছা করিলে যতদিন ইচ্ছা ততদিন জজীয়তী করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি অবসর গ্রহণ না করিলে হাইকোর্টের নবীন উকিলগণ বিচারক-পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না—এই কারণে তিনি তাঁহাদিগকে উন্নত হইবার অবকাশ দিবার জন্য স্বয়ং ৬০ বৎসর বয়স পূর্ণ হইতেই অবসর গ্রহণ করেন।

গুরুদাসবাবুর অবসর-গ্রহণকালে হাইকোর্টের দেশীয় ও বিদেশীয় ব্যবহারাজীবগণ একবাক্যে তাঁহার অশেষ প্রতিভাময় কার্য্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত রামচরণ মিত্র, সি-আই-ই উকিলগণের পক্ষ হইতে এবং এড্‌ভোকেট-জেনারেল মিঃ জে-টি উড্‌রফ ব্যারিষ্টারগণের পক্ষ হইতে তাঁহার অশেষ গুণগান করেন।

স্যর গুরুদাস দীর্ঘ ষোল বৎসরকাল হাইকোর্টে জজীয়তী করিয়াছিলেন, একথা পুর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ষোল বৎসরের মধ্যে তিনি নিতান্ত অনিবার্য্য কারণ ভিন্ন হাইকোর্টে অনুপস্থিত হন নাই। এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, সেই ঘটনাটি

হইতে তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি, তখন একদিন যতীন্দ্রচন্দ্র নামক তাঁহার একটি পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্রের বিসূচিকা হয়। প্রাতঃকালেই বালকটীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় দেখা যায়, তাহা সত্ত্বেও গুরুদাসবাবু হাইকোর্টে আপন কর্ত্তব্য-সম্পাদনের জন্য গমন করেন এবং বিচারাসনে বসিয়া বিন্দুমাত্র উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার ভাব প্রদর্শন না করিয়া আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিতে থাকেন। পরে প্রধান বিচারপতি কোনও সূত্রে তাহা জানিতে পারিয়া গুরুদাস-বাবুকে আদালত বন্ধ করিয়া বাটী যাইতে বলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাসবাবু সেই বালকটীর স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য "যতীন্দ্রচন্দ্র পদক" ও একটি পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। এই পদক প্রতি বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যে বালক প্রথম স্থান অধিকার করে তাহাকে দেওয়া হয় এবং হেয়ার স্কুল হইতে যে বালক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম হয় তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ মূল্যবান্ পুস্তকাদি দেওয়া হয়। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনেও তিনি যতীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি পদক পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাসবাবুর মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি মাতার স্মৃতি-রক্ষণার্থ প্রতিবৎসর সংস্কৃত ভাষায় এম্-এ পরীক্ষা দিয়া যিনি প্রথম স্থান লাভ করেন তাঁহাকে "সোনামণি পুরস্কার" দিবার ব্যবস্থা করেন। মাতৃশ্রাদ্ধের সময় তিনি উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে "সামবেদ" নামক অমূল্য গ্রন্থ বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপাইয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। সেই গ্রন্থের উপরের পৃষ্ঠায় লিখিত ছিল ঃ—

মাতৃবিয়োগ

"গ্রন্থোঽয়ং গুরুদাসেন শ্রুতি প্রচার কাঙ্ক্ষিনা
স্বর্গ কামনয়া মাতুর্দত্তো ভক্ত্যা মনীষিণে।"

গুরুদাসবাবু শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা করিতেন। ভোজনের সময় গুরুদাসবাবু সমস্ত নিমন্ত্রিতের সমীপে যাইয়া আহারাদির তত্ত্বাবধান করিতেন এবং আহূত, অনাহূত ও বাটীর সমস্ত লোকজনের আহারাদি সমাপ্ত হইলে তবে তিনি আহারে বসিতেন।

অমায়িকতা

স্যর গুরুদাস সম্বন্ধে একটি বড় আশ্চর্য্যজনক গল্প প্রচলিত আছে। একদিন একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাহার বাটীতে পূজার জন্য পুরোহিতের প্রতীক্ষায় কুটীর-দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। গঙ্গাবগাহন করিয়া গুরুদাসবাবু সেই সময়ে পদব্রজে বাটীতে আসিতেছিলেন। বৃদ্ধা তাঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ভাবিল যে, এই ব্যক্তি পুরোহিত ব্রাহ্মণ হইবে। এই ভাবিয়া বৃদ্ধা গুরুদাসবাবুকে তাহার বাটীতে পূজা করিবার জন্য ডাকিল। গুরুদাসবাবু বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া বৃদ্ধার কুটীরে প্রবেশ করিয়া পূজা করিলেন।

সৌজন্য

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী দীর্ঘ ষোল বৎসর হাইকোর্টে জজীয়তী করিবার পর গুরুদাসবাবু অবসর গ্রহণ করিয়া দেশে শিক্ষা-সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করেন। তিনি মেসে বা বোর্ডিংয়ে ছেলেদের নামমাত্র একজন তত্ত্বাবধারকের অধীনে রাখার চেয়ে, বাড়ীতে আপন আপন অভিভাবকের অধীনে রাখা বিশেষ উপকারী বলিয়া মনে করিতেন। স্যর গুরুদাসের মতে প্রথমাবস্থা হইতে কিছু কিছু প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রত্যেক ছাত্রকেই শিক্ষা দেওয়া উচিত। তিনি বলিতেন, ছাত্রগণ যতই অধ্যয়নে অগ্রসর হইবে ততই তাহাদিগকে কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্য-ব্যবসায় ক্রমশঃ শিক্ষা দিতে হইবে; এ কারণ কার্য্যকরী শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত দরকার। স্যর গুরুদাস নিজেও একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন। "Hindu Law of Marriage and Stridhan" নামক

শিক্ষাসম্বন্ধে গুরুদাস

তাঁহার পুস্তক আইন-অধ্যায়ী ছাত্র ও উকিলগণের নিকট সমাদৃত। "A few thoughts on education in India" নামক গ্রন্থে তিনি শিক্ষা-সম্বন্ধে কয়েকটী জটিল সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। এই পুস্তকে গুরুদাস-বাবুর ভূয়োদর্শন-প্রসূত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কি করিলে ছাত্রগণকে সুন্দর উপায়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহারা সুন্দররূপে শিক্ষক কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ও ব্যাখ্যাত বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে—এই পুস্তিকাদ্বয়ে তাহা গুরুদাসবাবু অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" আধ্যাত্মিক জ্ঞানগর্ভ অতি গভীর চিন্তাপ্রসূত পুস্তক। গীতার প্রত্যেক উপদেশ কিরূপে আপন আপন দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা যায়, "জ্ঞান ও কর্ম্মে" গুরুদাসবাবু তাহা অতি সুন্দররূপে যুক্তি-তর্কের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। গণিতশাস্ত্র গুরুদাসবাবুর বড় প্রিয় ছিল। তিনি ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি-বিষয়ে পুস্তক লিখিয়াছিলেন। এইসমস্ত পুস্তকে সহজ সরল প্রণালী ও প্রক্রিয়া এবং নিয়মের দ্বারা গুরুদাসবাবু কঠিন কঠিন বিষয়সমূহ বুঝাইয়াছিলেন; তাহাতে পুস্তকগুলি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল। স্যর গুরুদাস কি ইংরেজী, কি বাঙ্গলা উভয় ভাষাতেই কবিতা লিখিতে পারিতেন। সঙ্গীত-রচনাতেও তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখা যাইত। অনেক সভাসমিতিতে তাঁহার রচিত সঙ্গীতাদি গীত হইত। এস্থলে দুই একটির মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে—

১। ভারত-সম্রাটের ভারতে শুভাগমনে স্যর গুরুদাস নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করেন ঃ—

সিন্ধু—তেওরা

"কৃতার্থ ভারতবাসী—তব শুভ আগমনে
জানি না রাজরাজেশ্বর, পূজিব তোমায় কেমনে॥

অতুল রাজসম্মান, দিয়াছেন ভগবান
আমরা কি দিব আর ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি বিনে॥
সতত প্রজাবৎসল, যশোজ্যোতি সুবিমল
রেখেছ বিপুল রাজ্য, কি আশ্চর্য্য সুশাসনে।
তোমারি গুণের তরে, দৃঢ়ভক্তি প্রেমডোরে
রয়েছে মোদের প্রাণ, বাঁধা তব সিংহাসনে॥"

গুরুদাসবাবুর চরিত্রের এক বিশেষ গুণ ছিল তাঁহার গুণগ্রাহিত্ব। "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথকে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন—

"উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকো না আর।
অজ্ঞান-তিমিরে তব সুপ্রভাত হলো হের।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব "বাল্মীকি-প্রতিভা" দেখাইতে পুনর্ব্বার!
হের তাহে প্রাণভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি, খোঁজ যাহা দিবানিশি
ও ভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর।"

বঙ্গের তোরণ-দ্বারে বঙ্গবিভাগকালে যখন জাতীয় শিক্ষার শুভ-শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছিল এবং বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তখন স্যর গুরুদাস তাঁহার অগ্রগণ্য উদ্যোক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-মন্দিরের ছাত্রগণের পারিতোষিক-বিতরণ-সভায় তাঁহার রচিত একটী সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। সঙ্গীত এই—

"ভুল না আনন্দময়ে আজি এ আনন্দ দিনে
সুখে স্থৈর্য্য দুঃখে ধৈর্য্য কে দিবে আর তিনি বিনে।

দুইজন প্রতিনিধি নিজেদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া সিনেট-সভায় পাঠাইবার অধিকার লাভ করেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাসবাবু ভারতীয় ইউনিভার্সিটী কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন। এই কার্য্যপ্রসঙ্গে তিনি ভারতের যাবতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন-সভায় ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিতে স্তর গুরুদাস যত তৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগ করিতেন, আর কিছুতে সেরূপ করিতেন না।

স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আইন-ব্যবসায়ী ও বিচারক হইলেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি-সাধন ও দেশে শিক্ষাবিস্তার-প্রসঙ্গে যাহা করিয়াছিলেন তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্তর গুরুদাস অতি অকপট হিন্দু ও রক্ষণশীল-দলভুক্ত ব্রাহ্মণ হইলেও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি কখনও উদাসীন কিংবা বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন না। কিন্তু তিনি বৈদিক ধর্ম্ম ও পুরাণাদি-সম্মত প্রণালীতে আর্য্যরমণীগণকে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি মহিলাগণের উচ্চশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু তিনি এমন শিক্ষা তাঁহাদিগকে দিতে চাহিতেন যাহাতে তাঁহারা হিন্দুনারীর প্রাচীন আদর্শ বজায় রাখিয়া গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিতে পারেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌ভোকেশন-বক্তৃতায় মহিলা গ্রাজুয়েটগণকে উপাধি-প্রদানকালে স্তর গুরুদাস তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

"The encouragement of female education by its degress and other marks of distinction must rank as one of the highest usdful functions of this University. No community can be said to be an educated community unless its female members are educated, that is, not simply taught to read and write, but educated in the true and full sense of the word."

স্যর গুরুদাসের মতই ছিল—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈবাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়া॥

অর্থাৎ যেখানেই স্ত্রীজাতি সম্মানিতা হন, সেখানেই দেবতাগণ বিরাজ করেন। যেখানে স্ত্রীজাতি সম্মানিতা না হন, সেখানে সকল অনুষ্ঠানই নিষ্ফল হয়।

কৃষিশিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষা দিবার জন্য তিনি প্রাণপণ প্রযত্ন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এবিষয়ে নিযুক্ত কমিটিতে অসুস্থ শরীরেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সে সময়ে অত্যন্ত অসুস্থ, তাহা সত্ত্বেও সিনেট-সভায় দাঁড়াইয়া যুবার ন্যায় উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"বাণিজ্যশিক্ষা, কৃষিশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা না দিলে এই জাতির আর উন্নতির উপায় নাই। ভারতবর্ষে আর সে জাতিভেদ নাই, প্রতীচ্যেও উচ্চনীচ-প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। কৃষকের পুত্র এখন আর কৃষক নহে। ইংলণ্ডে একজন ক্ষৌরকারের পুত্র লর্ড চ্যান্সেলর হইয়াছেন। বাঙ্গালাদেশেও একজন কৃষকের পুত্র বিজ্ঞানসভার প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছেন। লোকের জীবনসংগ্রাম এখন দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। এখন শিল্প ও কৃষির সামান্য জ্ঞানে আর চলিবে না। এক্ষণে আমরা শ্রমশিল্পের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিতেছি, কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন শিল্প ও কৃষিশিক্ষা দিতেই হইবে।"

সিনেট-সভায় স্যর গুরুদাসের বক্তৃতা এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে, সকলে তাঁহার প্রস্তাবনা একবাক্যে গ্রহণ করেন।

স্যর গুরুদাস খাঁটী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ধর্ম্মকর্ম্মেও তাঁহার যথেষ্ট অনুরক্তি ছিল, একথা বলাই বাহুল্য। কাজেই তিনি বিদ্যালয়ে

ছাত্রগণকে তত্ত্বধর্ম্ম শিক্ষা দিতে সর্ব্বদা সমুৎসুক ছিলেন। কেবল কতকগুলি শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করিলে এবং বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিলেই যে ধর্ম্মকার্য্য সুসম্পন্ন হয় মহাত্মা গুরুদাস এই মতের পোষকতা করিতেন না। নৈতিকতা যেমন আপন জীবনে প্রতিপালন করিতে হয়, সেইরূপ ধর্ম্মও নিজের জীবনে ব্যবহারের জিনিস, শুধু পুস্তকে পড়িবার জিনিস নহে। তিনি প্রায়ই বলিতেন—

ধর্ম্মশিক্ষায় গুরুদাস

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

অর্থাৎ যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখিতে পায় এবং প্রত্যেক বস্তুতে আমাকে দেখিতে পায়—সে আমাকে কখনও হারায় না, আমিও তাহাকে কখনও হারাই না।

বিদ্যালয় অপেক্ষা গৃহই ধর্ম্মশিক্ষা দিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র—তিনি ইহা মনে করিতেন।

মহামতি গুরুদাস দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে ধনীর উচ্চপ্রাসাদবাসী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া দরিদ্র হওয়ার যে কি জ্বালা এবং দরিদ্র অভিভাবককে পুত্রের শিক্ষার জন্য যে কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় তাহা তিনি বিস্মৃত হন নাই। ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে সিনেট-সভায় প্রবেশিকা ও আই-এ পরীক্ষার ফী বাড়াইবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। দরিদ্র-বন্ধু স্যর গুরুদাস তখন আর একবার যুবাজনোচিত উচ্চস্বরে সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। প্রবেশিকা ও আই-এ-পরীক্ষার্থীদের দরিদ্র অভিভাবকগণের রক্ত শোষণ করিয়া পোষ্টগ্রাজুয়েটবিভাগ রক্ষা করার তিনি বিশেষ বিরোধী ছিলেন।

পরীক্ষার ফী ও গুরুদাস

আজ বাঙ্গালা সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন হইতে উচ্চ পরীক্ষায় পর্য্যন্ত স্থান লাভ করিয়াছে। যে সাহিত্য এতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে প্রবেশের অধিকার পায় নাই, সেই চির-অনাদৃতা, চিরলাঞ্ছিতা, চিরদুঃখিনী বঙ্গভাষা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আদৃতা ও সম্মানিতা হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষার প্রতি এই সমাদর যাঁহাদের চেষ্টায় হইয়াছে স্যর আশুতোষের ন্যায় স্যর গুরুদাসও তাঁহাদের অন্যতম।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রচলনে

স্যর গুরুদাস বঙ্গভাষার সেবক ছিলেন বঙ্গভাষাকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন, ভালবাসিতেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একজন অকৃত্রিম সুহৃৎ ও একজন অকপট শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন হইতে উচ্চ শ্রেণীর যাবতীয় গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস শিক্ষা দিবার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন স্যর গুরুদাস সেই প্রস্তাবের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

মহামতি গুরুদাসের গার্হস্থ্য-জীবন অতি মধুর, অতি পবিত্র। তাঁহার জননী যেরূপ সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, অতি অল্পসংখ্যক মাতাই সেরূপ করিতে পারেন। গুরুদাস মাতৃভক্তির একটি জাজ্জ্বল্যমান মূর্ত্তি ছিলেন। গুরুদাস বড়ই স্নেহময় জনক ছিলেন। তিনি পুত্রগণকে বড় স্নেহ করিতেন, তাহাদের সহিত খেলাধূলা করিতেন, আবার প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে শাস্তি দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। পুত্রগণকে তিনি এমনই ভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে, তাহারা বিশেষরূপে পীড়িত না হইলে ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিয়া জলস্পর্শ করিত না। গুরুদাস আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পূজা-

গার্হস্থ্য-জীবনে স্যর গুরুদাস

আহ্নিক না করিয়া বিন্দুমাত্র জলগ্রহণ করিতেন না। এইভাবে উপবাসে তিনি এতদুর অভ্যস্ত হইয়াছিলেন যে, শরীর অসুস্থ হইলে তিনি দুই তিন দিন বার্লি মাত্র পথ্য খাইয়া হাইকোর্টে যাইয়া আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিতেন। প্রথম ইউনিভার্সিটী কমিশনের সময় তাঁহাকে সমগ্র ভারতময় ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, সেই সময় তিনি কোনও কোনও দিন অনাহারেই থাকিতেন। যদি কোনও দিন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাটীতে আহারের আয়োজন হইত তবেই আহার করিতেন। স্যর গুরুদাসের বাটীতে গেলে বঙ্গের প্রাচীন রীতিনীতি-পদ্ধতির দৃশ্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। স্যর গুরুদাস পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-সলিলে অবগাহন করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। যখন তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি তখনও তিনি সুদুর নারিকেলডাঙ্গা হইতে পদব্রজে বাগবাজারে যাইয়া গঙ্গাস্নান করিতেন। যখন সেই ব্রাহ্মণ নিতান্ত সরলভাবে গঙ্গাস্নানে যাইতেন তখন লোকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত এবং কেহ কেহ বা ভক্তি-আপ্লুতচিত্তে করজোড়ে তাঁহাকে নমস্কার করিত। রবিবারে তাঁহার গঙ্গাস্নানে যাইবার সময়ে নারিকেলডাঙ্গা হইতে বাগবাজার পর্য্যন্ত সমস্ত যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলেই উদ্‌গ্রীবনেত্রে তাঁহার দর্শনাভিলাষে রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিত। এমন কি, অল্পবয়স্ক বালকেরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে এমনইভাবে চিনিয়াছিল যে, তিনি তাহাদের দৃষ্টিপথে পড়িবামাত্র অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে তাঁহাকে দেখাইয়া দিত।

মহাত্মা গুরুদাস বাগবাজারে গঙ্গাতীরে একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই অট্টালিকায় তাঁহার মাতাঠাকুরাণী জীবনের শেষ কয়েক দিন বাস করিয়াছিলেন। গুরুদাসবাবু যখন নিজে বুঝিলেন যে, এবার তাঁহার মহাসিন্ধুর ওপার হইতে শেষ আহ্বান আসিয়াছে, তখন তিনি সেই বাটীতে তাঁহাকেও স্থানান্তরিত করিতে

বলিয়াছিলেন। যে বাটীতে তাঁহার মাতার পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়াছিল, সেই বাটীতে মহাত্মা গুরুদাসও সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

মহাত্মা গুরুদাস আপন নারিকেলডাঙ্গা পল্লীতে একজন সদাশয় প্রতিবেশী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। নারিকেলডাঙ্গা পল্লীতে প্রতিবেশীগণের মধ্যে যত প্রকার গোলমাল বা বৈষয়িক গোলযোগ উপস্থিত হইত স্যর গুরুদাস মধ্যবর্ত্তী হইয়া তৎসমস্ত মিটাইয়া দিতেন। তাঁহার মীমাংসা সকলেই নিরপেক্ষ মীমাংসা বলিয়া নত-মস্তকে গ্রহণ করিত। মহাত্মা গুরুদাসের অনেক কার্য্য ছিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি প্রতিবেশীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কোলাহলনিষ্পত্তিতে নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না; কারণ তাঁহার এই ধারণা ছিল যে, তাঁহার একটু পরিশ্রমে ও যত্নে দরিদ্র প্রতিবেশীর মকদ্দমায় অর্থনাশের হাত হইতে অব্যাহতি পায় তবে তাহাও ভাল। নারিকেলডাঙ্গা পল্লীতে এমন কোন উৎসব, ক্রিয়া-কলাপ হইত না যাহা তাঁহার বিনা অনুমতি বা বিনা উপস্থিতিতে হইত। পল্লীর দরিদ্র বালকগণ যাহাতে যথোপযুক্ত শিক্ষালাভ করে তদুদ্দেশ্যে তিনি নারিকেলডাঙ্গা হাই স্কুল-স্থাপনে প্রভূত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত উক্ত স্কুলের কার্য্যনির্ব্বাহকল্পে প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেন। তিনি স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণকে স্বয়ং প্রতি রবিবারে পড়াইতেন। স্যর গুরুদাস একদিকে অতি কোমল প্রকৃতির হইলেও অন্যদিকে তাঁহার কঠোরতা ছিল। তিনি তাঁহার পুত্রগণের অথবা জামাতৃগণের মধ্যে যাঁহারা হাইকোর্টের ব্যবহারাজীব তাঁহাদিগকে তাঁহার এজলাসে ওকালতি করিতে দিতেন না—পাছে পুত্র বা জামাতৃগণের প্রতি স্নেহাধিক্যপ্রযুক্ত তিনি বিচার-বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া বসেন। তিনি কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রকাশ্যভাবে যোগদান না করিলেও দেশে যে কোনও প্রকারের

রাজনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হউক না কেন, তাহাতে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইত।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাসবাবু অনারারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্-পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন তিনি কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিশনারও ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাসবাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে গুরুদাসবাবুকে ভারত গবর্ণমেণ্ট "স্যর" উপাধি-ভূষণে ভূষিত করেন। স্যর গুরুদাস একজন অকপট হিন্দু হইলেও তিনি আবশ্যকস্থলে সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতেন না। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগরমহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলন করিতে চেষ্টা করায় হিন্দুসমাজ তাঁহাকে পরিবর্জ্জন করে। গুণগ্রাহী মহাত্মা গুরুদাস কিন্তু তাঁহার মায়ের শ্রাদ্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতৃভক্তির চরম উদাহরণ-স্থল ছিলেন, গুরুদাসবাবুও মাতাকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরীর ন্যায় ভক্তি করিতেন। কাজেই বিদ্যাসাগর মহাশয় গুরুদাসবাবুর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ও তাঁহার গুণে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

স্যার গুরুদাসের বদান্যতাও যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ হস্ত যাহা দিত তাঁহার বামহস্ত তাহা জানিতে পারিত না। তিনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য করিতেন। প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট কেহ যাইলে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিত না। তিনি সহরের অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সহায়ক ছিলেন। স্যর গুরুদাস কখনও কাহাকেও এক পয়সা ধার দিতেন না, কিম্বা কাহারও নিকট এক পয়সা ধার করিতেন না। এক সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের কুড়ি হাজার টাকার প্রয়োজন হয়। গুরুদাসবাবু ঐ টাকা দিতে পারেন—ইহা মনে করিয়া নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ফকস্ গুরুদাসের নিকট যাইয়া প্রস্তাব করেন যে, আপনি যদি এই কুড়ি হাজার টাকা ধার

দেন তবে আপনাকে শতকরা মাসিক তিন টাকা হিসাবে ছয় শত টাকা সুদ দেওয়া হইবে। গুরুদাসবাবুর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি কাহাকেও এক পয়সা ধার দিবেন না কিংবা কাহারও নিকট হইতে এক পয়সা ধার গ্রহণ করিবেন না। তিনি অতি বিনয়-নম্রভাবে নবাবের প্রাইভেট্ সেক্রেটারীকে বলিলেন যে, তিনি এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন না। স্যর গুরুদাসের আত্ম-সম্মান-জ্ঞান এত প্রবল ছিল যে, তিনি কাহারও নিকট হইতে কখনও কোনও অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেন না। এস্থলে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। ঘটনাটী এই, যখন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল তখন তিনি একজন জেলা-জজের এজলাসে একটি মোকদ্দমায় উপস্থিত হন। স্যর গুরুদাসের অল্প বয়স এবং বালকের ন্যায় আকৃতি দেখিয়া বিচারকের মনে সন্দেহ হয়—তিনি হাইকোর্টের উকিল কি না। তিনি একটু সন্দিগ্ধভাবে গুরুদাসবাবুকে বলিলেন, "আমি কেমন করিয়া জানিব যে, আপনি হাইকোর্টের একজন উকিল?" স্যর গুরুদাস বলিলেন, "আমার জুনিয়র উকিল এই আদালতের একজন উকিল, তিনিই বলিবেন আমার কথা সত্য কি না?" বিচারক তাহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন গুরুদাস বাবু দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "বেশ কথা, আমি এইখানে আপনার সম্মুখে হাইকোর্টের উকিল বলিয়া দাঁড়াইতেছি, আপনি আমাকে জালিয়াতির অপরাধে গ্রেপ্তার করিতে পারেন।" ইহা শুনিয়াই বিচারক চুপ করিলেন।"

অন্তিমশয্যা

লেপ্টন্যান্ট্-করনেল ডাক্তার স্বর্গীয় সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি-আই-ই, এম্-ডি, আই-এম্-এস গুরুদাসে পীড়িতাবস্থায় তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, স্যর গুরুদাস রক্তামাশয়-রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার্থ আমাকে আহ্বান করেন। আমি দুই তিন দিন চিকিৎসা করিবার

পর যখন কোনও মতেই তাঁহাকে আরোগ্যের পথে আনিতে পারিলাম না, তখন গুরুদাসবাবু আমাকে বলিলেন, "ডাক্তারবাবু! আপনি কি আমাকে নিরাময় করিতে পারিবেন বলিয়া ভরসা দিতে পারেন?" আমি বলিলাম, "তা কিরূপে পারিব?" তখন গুরুদাসবাবু বলিলেন, "যখন আপনি আমার জীবনের আশা দিতে পারেন না, তখন আমাকে গঙ্গাতীরে যাইতে দেন না কেন?" আমি নীরব রহিলাম। তৎপর-দিন তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ অট্টালিকায় স্থানান্তরিত করা হইল। মুক্ত বাতায়নের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র বীচিমালা-বিক্ষোভিত দেবী সুরধুনির অপরূপ শোভা দেখিয়া মহাত্মা গুরুদাস ক্ষণিকের জন্য রোগ-যন্ত্রণা বিস্মৃত হইলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া পুত্রদের এবং আত্মীয়-স্বজনের কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না যে, তিনি কঠিন পীড়ায় যন্ত্রণা ও কষ্ট পাইতেছেন। মৃত্যুর দিন বেলা এক ঘটিকার সময় তাঁহার পেন্সনের চেক আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া আমাকে বলিলেন, "ডাক্তারবাবু আমি চেকে সহি দিতে পারি কি না?" আমি সম্মতি দেওয়ায় তিনি ধীরে ধীরে চেকখানি লইয়া আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া বলিলেন; "ডাক্তারবাবু, আমার এই শেষ পেনসন হইয়া গেল।" শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইবেন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে স্যর গুরুদাস চেকে যে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্বাক্ষর অপেক্ষা উহার কোনও অংশেই ব্যতিক্রম হয় নাই। বলা বাহুল্য, সেই স্বাক্ষরে ব্যাঙ্ক হইতে চেকের টাকা মিলিয়াছিল।

বেলা এক ঘটিকার সময় তিনি পেন্সনের চেকে স্বাক্ষর করিলেন। তাহার পর গঙ্গার দিকের জানালা খুলাইয়া তিনি নির্ণিমেষনেত্রে সেদিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গীতা পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি কাহারও সহিত বাক্যবিনিময় না করিয়া একমনে গীতা-পাঠ শ্রবণ

করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর করাল ছায়া যতই তাঁহার উপর ঘনীভূত হইতে লাগিল, তাঁহার মুখমণ্ডলও ততই কৃষ্ণবর্ণ না হইয়া উত্তরোত্তর স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। কি সে সৌম্যশান্ত মূর্ত্তি! দেখিতে দেখিতে দুইটা, তিনটা, চারিটা, পাঁচটা বাজিল। প্রতীচী গগনে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের সুবর্ণ কিরণ বাতায়ন-পথ দিয়া আসিয়া গুরুদাসের সর্ব্বাঙ্গে সোনার বর্ণ ঢালিয়া দিল। উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া জাহ্নবী-শীকর-সংপৃক্ত বায়ুরাশি ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহার শরীরে মলয় বীজন করিয়া দিল। ক্রমে সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ও গাঢ় অন্ধকার আসিয়া ধরণীর মুখ আবৃত করিল। গুরুদাস তথাপিও নিবাত, নিষ্কম্প প্রদীপটীর মত ধীর-স্থির পলকহীননেত্রে একদৃষ্টিতে গঙ্গার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমে রাত্রি সাতটা, আটটা, নয়টা, দশটা হইল, তথাপি গুরুদাসের কোন উদ্বেগ নাই। ১০।১৫ মিনিটে গুরুদাস পুত্রকে ইঙ্গিতে তাঁহার আপাদমস্তক ঢাকিয়া দিতে বলিলেন; তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। তার পর দক্ষিণকরে উপবীত ধারণ করিয়া অস্ফুটস্বরে গায়ত্রী জপ করিয়া তিনবার বলিলেন, "এই শেষ" এই শেষ"। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও জীবন-নাট্যের যবনিকা পতিত হইল। রাত্রি ঠিক ১০টা ৩০ মিনিটে সব শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গগন হইতে একটী অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।

স্যর গুরুদাসের বংশধরগণ

মহাত্মা গুরুদাস বিধবা পত্নী, চারিটী পুত্র-রত্ন এবং দুইটী কন্যা রাখিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। পুত্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কৌন্সিলের সেক্রেটারী; দ্বিতীয় রায় বাহাদুর ডাক্তার শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, ডি-এল্, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রিবিউন্যালের প্রেসিডেণ্ট; তৃতীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌ গভর্ণমেণ্টের একাউণ্টস্‌ বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী; চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ, প্রেসিডেন্সী কলেজের উদ্ভিদ্‌ বিদ্যার অধ্যাপক। মহাত্মা গুরুদাসের জ্যেষ্ঠা দুহিতার সহিত হাইকোর্টের প্রথিতযশা উকিল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল মহাশয়ের (ইনি এক্ষণে হাইকোর্টের জজ) এবং দ্বিতীয় কন্যার সহিত হাইকোর্টের অন্যতম উকিল শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় বি-এলের বিবাহ হইয়াছে।

স্যর গুরুদাসের মৃত্যুতে বহু শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। এরূপ ক্ষুদ্র পরিসরে সে সকলের উল্লেখ করা সম্ভবপর না হইলেও দুই একটির উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৯১৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন-সভায় বক্তৃতার প্রারম্ভে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড বলেন—

দেশব্যাপী শোকপ্রকাশ

"The memory of Sir Gooroodas Banerjee, the first Indian to be selected as your Vice-Chancellor, will long be cherished among you......He was a living refutation of the view that Western lore is incompatible with Eastern simplicity and manners. He had drunk deeply at the wells of western thought and science. Yet he held firmly to all that is best in the civilization wherein he was born." অর্থাৎ ভারতবাসীদের মধ্যে স্যর গুরুদাসই প্রথম ভাইস্‌-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন, সে হিসাবে তিনি চিরদিন এদেশবাসীর স্মৃতিপথারূঢ় থাকিবেন। তিনি প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিলেও নিজের জীবনে হিন্দুত্ব সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

মাননীয় স্যর ল্যান্সেলট স্যাণ্ডারসন্ বলেন—"He was a great scholar and a man who devoted his whole life whether as a Judge of the High Court or in other capacities, to the public service, and he will always be remembered as one of the foremost men of his time." কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিরূপেই হউক অথবা অন্যভাবেই হউক, তিনি দেশের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

১৯১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সিনেট সভায় লর্ড রোণাল্ডসে বলেন—"He was an ardent admirer of Bengali literature and he was a profound student of Hindu scriptures." তিনি বঙ্গসাহিত্যকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং হিন্দু রীতি-নীতির অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

হাইকোর্টের শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মিত্র, সি-আই-ই, এম্-এ-বি-এল্ বলেন—"He always acted strictly up to the high standard of morality which he preached to his students and never swerved from the path of rectitude."

দ্বারবঙ্গের মহারাজা একটি শোকসভায় বলেন—"He exemplified in his life that to be a Hindu of the old type, does not mean that one's views should be narrow or bigotted—that to be versed in western thought and science does not mean that one should fall a prey to its glamour." অর্থাৎ তাঁহার আপন জীবনের কার্য্য দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিলেই পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুকরণ করিতে হইবে তাহা নহে।

ভারত-সভার অধিবেশনে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি-এস্-

আই, এম্-এ, বি-এল বলেন—"Sir Gooroodass has left the country richer than what it was before, for the richest legacy which a man can leave to posterity is the example of his life and character."

এই সকল ব্যতীত দেশে এমন ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দু সংবাদ ও সাময়িক পত্র ছিল না যাহাতে তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা না হইয়াছিল। স্যর গুরুদাস গিয়াছেন, মানুষের যেখানে চরম পরিণতি তিনি সেই রাজ্যেই গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আপন জীবন-চরিত্রের দ্বারা তিনি যে শিক্ষা দেশবাসীকে দিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় এদেশের অধিবাসিবৃন্দের সম্মুখে দেদীপ্যমান থাকিবে। তিনি পুণ্যবান ছিলেন, পুণ্যাত্মার ন্যায় সশরীরে গঙ্গাক্রোড়ে দেহ রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু দেশবাসীর হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার মূর্ত্তি চিরদিন পূজিত হইবে।